আশ্চর্য পুকুর

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১১ই কার্তিক ১৩৬৯

প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা— ৯

মুদ্রাকর :
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স
১নং ছিদামমুদি লেন,
কলিকাতা— ৬

আমাদের স্কুলে যিনি বাংলা ব্যাকরণ পড়াতেন তিনি ছিলেন চিমটি স্পেশালিস্ট। বিভিন্ন ধরনের চিমটি আবিষ্কার করে তিনি ছাত্র মহলে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। খ্যাতির কারণ চিমটি নয়, চিমটির নাম। চিমটির তিনি চমৎকার চমৎকার সব নাম দিতেন। সমাস-চিমটি, সন্ধি-চিমটি, এককথায় চিমটি, বিপরীত শব্দে চিমটি...। চিমটি অ্যাপ্লাই করার আগে স্যার ক্লাসে উচ্চ-গলায় চিমটির নাম ঘোষণা করতেন। তারপর মিটিমিটি হেসে বলতেন, 'এই নাম কি তোমাদের পছন্দ হয়েছে?' আমরা সমস্বরে বলতাম, 'খুবই হয়েছে স্যার। তবে খেয়াল রাখবেন যেন বেশি না লাগে।' স্যার মাথা নাড়তেন কিন্তু খেয়াল রাখতেন না। চিমটিতে যথেষ্টই লাগত। গোটা পিরিয়ডটা জ্বালা জ্বালা করত। তবে চোখ দিয়ে জল বের হওয়ার মতো লাগত না।

ব্যাকরণ স্যার যেদিন অবসর নিলেন সেদিন একটা কাণ্ড হল। হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে স্যার ধরা গলায় বললেন, 'ছেলেরা, তোমাদের অনেক ব্যথা দিয়েছি। আজ যদি ইচ্ছে হয় তোমরা এসে আমাকে একটা করে চিমটি কেটে যেতে পারো। আমি কিছু মনে করব না। তবে দেখবে, জীবনে ব্যাকরণ যেন ভুল না হয়।'

চিমটিতে যা হয়নি, স্যারের কথা শুনে আমাদের তাই হল। সবার চোখে জল এসে গেল।

স্কুল জীবন এরকমই হয়। এই জীবনে হাসিতেও আনন্দ, চোখের জলেও আনন্দ থাকে। অন্য কোন জীবনে এই জিনিস পাওয়া যায়?

নানা ধরনের গল্পের সঙ্গে স্কুল জীবন অনেকগুলো গল্প লিখলাম এই বইতে। শুধু আমার স্কুল জীবন নয়, তোমাদের সকলের স্কুল জীবন। লেখার পর দেখলাম, সব গল্প সত্যি হল না, অথচ কোনও গল্পই যেন মিথ্যে নয়!

তোমাদের দিনগুলো এমনই আনন্দময় হোক।

গল্পের সূচি

আশ্চর্য পুকুর

হারলেও হাসে

টিফিনের সময় মিটিং বসল।

এ ধরনের গোপন এবং জরুরি মিটিং আমরা সাধারণত করি স্কুলের পেছন দিকটায়। ঝাঁকড়া জামরুল গাছটার নীচে। সকলে গাছের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসি। পল্টু শুধু বসে গাছের ওপরে, ডালে পা ঝুলিয়ে। এই কারণে ওকে আমরা মাঝে মধ্যেই 'হনুমান পল্টু' বলে ডাকি। তাতে তার কিছু আসে যায় না। জরুরি সময়ে সে গাছের ডালে বসতেই পছন্দ করে।

আজ বসেছে। বলল, 'বন্ধুগণ, সব জিনিস মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এই জিনিস মেনে নেওয়া যায় না। অনেক হয়েছে আর নয়।'

তপন গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছে। দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছে। সবসময়ই সে এরকম করে। মনে হয়, সুযোগ পেলে লুকিয়ে ঘাস খায়ও। বলল, 'আমি পল্টুর কথা সমর্থন করি। শুধু সমর্থন করি না। একশো ভাগ সমর্থন করি। হার-জিতের থেকে অনেক বড়ো হল সম্মান। আমাদের সম্মান। ক্লাস সেভেনের সম্মান। সেই সম্মান রক্ষা করতে না পারলে ট্রফি, মেডেল জিতে লাভ কী?'

ফুচাইয়ের নামের মধ্যে একটা ফাজিল ফাজিল ব্যাপার আছে। কিন্তু সে যথেষ্ট গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে। আজ আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। বলল, 'প্রসূন, তোমাকে যে রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছিল সেটার কী হল?'

প্রসূন মন দিয়ে কেক খাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই বলল, 'আমার রিপোর্ট রেডি।'

তমাল ওর হাত থেকে কেকের বাকি অংশটা কেড়ে টুক্ করে নিজের মুখে পুরে ফেলল। তারপর বলল, 'আগে রিপোর্ট বল। তারপর খাবি।'

প্রসূন বেজার মুখে বলল, 'রিপোর্ট খুবই ভয়ঙ্কর এবং দুঃখজনক। শেষ এগারোটা ম্যাচে একই কাণ্ড হয়েছে। হেরে যাওয়ার পর বিশু

হেসেছে। দুটো ম্যাচের ঘটনা তো মারাত্মক। সে যতবার গোল খেয়েছে, ততবার মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিক ফিক করে হেসেছে। আশ্চর্যের কথা হল, ওই দুটো ম্যাচে আমাদের ফল, বাড়াবাড়ি রকমের খারাপ হয়েছিল। এত খারাপ যে, খেলা শেষে আমাদের টিমের দু-একজনের চোখে জল পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। নাম বলে আমি আর তাদের লজ্জায় ফেলতে চাইছি না। তাছাড়া এই রিপোর্ট কান্না নিয়ে নয়, হাসি নিয়ে। যাই হোক, হারবার পর বিশুর হাসবার রহস্য আমি বুঝতে পারছি না।'

মল্লিব্রত লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমি তোদের বলেছিলাম না? এবার বিশ্বাস হল তো?'

অজয় চোখ সরু করে বলল, 'আচ্ছা প্রসূন, তোর কী মনে হয়? এসব সময় বিশু কি চাইছিল, আমরা হেরে যাই?'

প্রসূন জিভ কেটে বলল, 'ছি, ছি এ কী কথা বলছিস! একথা আমাদের মনে আনাও অন্যায়। বিশু না খেললে আমাদের হাঁড়ির হাল হত। তাছাড়া ও তো শুধু দল হারলে হাসে না, নিজে গোল খেলে, আউট হয়ে গেলেও হাসে। স্পোর্টসের সময় যখন দু-একটা ইভেন্টে জিততে পারেনি তখনও খুব হাসাহাসি করেছে বলে খবর পেয়েছি। সুশান্ত বলছিল, হানড্রেড মিটারস্ আর হার্ডল রেসে পিছিয়ে পড়ে ও নাকি সব থেকে মজা পেয়েছিল।'

সুশান্ত চিন্তিত গলায় বলল, 'এটাই তো মুশকিল হয়েছে। হাসির মানে বোঝা যাচ্ছে না।'

সুকল্যাণ চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিল। শেষ দুটো ম্যাচে ক্লাস সেভেনের ভয়ঙ্কর পরাজয়ের পেছনে সুকল্যাণের অবদান খুবই বড়ো। সে দুটো সেমসাইড করেছে। একটা আবার হাতে লেগে। সুকল্যাণ উদাসীন গলায় বলল 'তোরা কিন্তু একটু ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিস। দুম্ করে কিছু করে বসিস না।'

অরূপ দুঃখী মুখ করে বলল, 'কোন ভাবনা চিন্তার আর সুযোগ নেই। আমরা যা ঠিক করেছি সেটাই আমাদের করতে হবে। কাজটা খুবই দুঃখের। আমাদের অসুবিধেও হবে খুব। কিন্তু উপায় নেই।'

তাপস ক্লাসের ফার্স্ট বয়। যে কোনও বিষয়ে মত দেওয়াটা তার

স্বভাব। তার বেশিরভাগ মতই অবশ্য শোনা হয় না। সে বলল, 'বিশুকে ডেকে একবার জিগ্যেস করলে হত না? ওরও তো একটা বক্তব্য থাকতে পারে।'

অরূপ বলল, 'থাকতে পারে। কিন্তু যে এরকম উদ্ভট আচরণ করছে তার মতামত জেনে কী হবে? তাছাড়া বিশুর জ্বর হয়েছে। আজ আসেনি। এটাই সুযোগ। বেচারি এখানে থাকলে আমরা এই কষ্টদায়ক সিদ্ধান্তটা কিছুতেই ওর সামনে নিতে পারতাম না। সুতরাং আর দেরি করাটা ঠিক হবে না।'

গাছের ওপর থেকে পল্টু বলল, 'অরূপ ঠিকই বলেছে। খুবই দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হচ্ছে। কারোর আপত্তি থাকলে হাত তোল।'

সকলে মাথা নামিয়ে বসে রইল। কেউ হাত তুলল না। এর মানে হচ্ছে, সিদ্ধান্তে সকলেই একমত।

খেলায় হারবার পরও হাসবার অপরাধে ক্লাস সেভেনের বিশ্বনাথ পাল ওরফে বিশুকে যাবতীয় টিম থেকে বাদ দেওয়া হল।

বিশুর মধ্যে একটা পাগল পাগল ব্যাপার আছে। চেহারায় কোন ছিরিছাঁদ নেই। চুলগুলো খোঁচা খোঁচা। হাঁটাচলাটা ল্যাগব্যাগে ধরনের। প্যান্টে ঠিকমত গুঁজতে জানে না। জুতোর ফিতে সবসময়ই খোলা। পাগলাটে ধরনের মানুষের মজা হল, সাধারণ ক্ষমতা না থাকলেও তাদের কিছু না কিছু অ-সাধারণ ক্ষমতা থাকে। বিশুরও সেরকম রয়েছে। তার অসাধারণ ক্ষমতা খেলাধুলোতে। সবধরনের খেলাতেই এই ছেলে দারুণ ওস্তাদ। ক্রিকেটে ওর ফিল্ডিং দেখলে চমকে উঠতে হয়। ঝপাং ঝপাং করে শুয়ে পড়ে এমন সব ক্যাচ ধরে যে নিজের দলের বোলার পর্যন্ত ঘাবড়ে যায়। এত ঘাবড়ে যায় যে আউট করার আনন্দে লাফাতে পর্যন্ত ভুলে যায়।

ফুটবলের সময় বিশু গোলকিপার। গোলপোস্টের দিকে আসা বল যখন সে ধরে তখন মনে হয় সে বুঝি কোনও মানুষ নয়। একটা পাখি। তার হাত দুটো আসলে দুটো ডানা। গোলপোস্টের দিকে আসা বল পাখির মতো উড়ে উড়ে সে ধরতে পারে।

একবার আমাদের গেম টিচার বিজয়বাবুর মাথায় ভূত চাপল।

তিনি বললেন, ফুটবল, ক্রিকেট একঘেয়ে হয়ে গেছে। এবার অন্যকিছু করতে হবে। তিনি হকি খেলার ব্যবস্থা করলেন। আমরা সবাই ভেবেছিলাম এ খেলায় বিশু তেমন কেরামতি দেখাতে পারবে না। পারবেই বা কী করে? হকি তো আর সে কখনও খেলেনি। ওরে বাবা! দশমিনিট পরে দেখা গেল সেখানেও বিশু মারাত্মক। হকি স্টিকে যেন আঠা লাগিয়ে মাঠে নেমেছে। বল তাকে ছেড়ে অন্যদিকে যেতেই চায় না যে!

এখানেই বিশুর খেলা-প্রতিভার শেষ নয়। ক্রিকেট, ফুটবল, হকির মতো বড়ো বড়ো খেলার পাশাপাশি কবাডি, পিট্টু, বল চোরের মতো, ছোটখাটো খেলাতেও বিশুর পারদর্শিতা দেখবার মতো। স্পোর্টর্সের সময় দৌড়, লং জাম্প, হাই-জাম্পে তার ধারে কাছে কারোর আসা শক্ত। অত প্রাইজ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বেচারিকে রিকশ ডাকতে হয়।

বিশু অবশ্য লেখাপড়াতেও ভয়ঙ্কর। যে কোনও পরীক্ষায় দুটো তিনটে বিষয়ে ফেল করা তার কাছে কোন ঘটনা নয়। তবে তাকে কখনও ক্লাসে রেখে দেওয়া হয় না। কারণ, তাহলে আমাদের ক্লাস টিমের কেলেঙ্কারি হত। বিশুর মতো তুখোড় খেলোয়াড় আমাদের ক্লাসে থাকলে কী হবে, দল হিসেবে ক্লাস সেভেন খুবই দুর্বল। এতই দুর্বল যে প্রায় সব খেলাতেই আমরা হেরে যাই। বিশু চেষ্টা করে খুব। যেখানে বারো গোলের হার অবশ্যম্ভাবী সেখানে বিশুর জন্য আমরা সাত গোলে হেরে ফিরি। যেখানে পঞ্চাশ রান আমাদের হার কেউ আটকাতে পারবে না, সেখানে কুড়ি রানে বিপক্ষ দল জিতে যায়। বিশু এর থেকে বেশি আর কী করতে পারে? ম্যাচ শেষ হলে অন্য ক্লাসের ছেলেরা ঠাট্টা করে বলে, 'এবার থেকে অতজনে মাঠে না নেমে তোরা বরং বিশুকে একা মাঠে নামা। দেখবি রেজাল্ট ভালো হবে।'

এই তো গত বছর আন্তক্লাস ফুটবল টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে বাহান্নটা গোল খেয়ে ক্লাস সেভেন রেকর্ড করল। তবে সেরা খেলোয়াড়ের ট্রফিটা কিন্তু পেয়েছিল বিশুই। সে ট্রফি পেল আটচল্লিশটা গোল বাঁচানোর জন্য। বিশু না থাকলে আমরা বাহান্নর বদলে ঠিক একশোটা গোল খেতাম।

অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় মাস্টারমশাইরা এই জিনিসটা মাথায় রাখেন। বিশুকে ক্লাসে উঠতে না দিলে আমাদের অবস্থা যে ভয়াবহ হবে সেটা ওঁরা বুঝতে পারেন। হেডস্যারের সঙ্গে অনেক আলোচনা-টালোচনা করে শেষপর্যন্ত স্পোর্টস গ্রাউন্ডে বিশুকে ক্লাসে তুলে দেওয়া হয়।

তবে গত ফুটবল টুর্নামেন্টের পর থেকে গেম টিচার বিজয়বাবু খুব রেগে আছেন। বলছেন, 'এতদিন জানতাম, চাঁদের মধ্যে কলঙ্ক থাকে। কিন্তু তোদের ক্লাসে দেখছি, একগাদা কলঙ্কের মধ্যে একটা চাঁদ পড়ে রয়েছে। এ আর মেনে নেওয়া হবে না। বিশুকে হয় ফেল করিয়ে আটকে দেব, নয়তো ডবল প্রমোশন দিয়ে উঁচু ক্লাসে তুলে নেব। না তোদের সঙ্গে আর ওকে রাখা যাবে না।'

বিজয়বাবুর এই হুমকি শুনে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। হারবারও একটা প্রেস্টিজ থাকবে না। এখনই তো আমাদের ক্লাসের নাম হয়ে গেছে, 'হেরো ক্লাস সেভেন', এরপরে হয়তো হবে 'সুপার হেরো ক্লাস সেভেন'। সে বড়ো লজ্জার হবে।

এতকিছুর পরও আমাদের কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে হল। ক্লাস টিম থেকে বিশুকে বাদ দিতে হল।

খবরের নিয়ম হল যে খবর যত বেশি গোপন রাখার চেষ্টা হবে সে খবর তত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে। এটার ক্ষেত্রেও তাই হল। টিফিনে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিলাম, ছুটির আগে সবাই সেটা জেনে গেল। অন্য ক্লাসের ছেলেরা এসে আমাদের ধরে ধরে জানতে চাইল, এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা আমরা কোন্ সাহসে ঘটালাম? আমরা চুপ করে থাকলাম। বেশি চাপাচাপি করলে বললাম, 'এটা ক্লাস সেভেনের নিজস্ব ব্যাপার। বলা যাবে না।'

আমাদের মন খুব খারাপ। খেলায় ক্লাস সেভেনের ভবিষ্যতের কথা ভেবেও খুব দুশ্চিন্তা হতে লাগল।

পরদিন স্কুলে যেতেই পল্টু, প্রসূন, সুকল্যাণকে বিজয়স্যার ডেকে পাঠালেন। চোখে মুখে টেনশন। টিচারস্ রুমের এক কোণে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'যা শুনছি সেটা সত্যি নাকি?'

সুকল্যাণ মাথা নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ স্যার সত্যি।'

স্যার আঁতকে উঠে বললেন, 'বলিস কী! সত্যি! ক্লাসশুদ্ধ তোদের সকলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

প্রসূন বলল, 'কিছু করার নেই স্যার। আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন।'

স্যার চাপা ধমকের গলায় বললেন, 'ক্ষমা করব মানে? বিশু না খেললে কী অবস্থাটা হবে একবার বুঝতে পেরেছিস্? হেডমাস্টারমশাইকে আমি কী কৈফিয়ত দেব? না কিছুতেই তোমাদের একথা শোনা যাবে না। বিশুকে তোমরা আজই দলে ফিরিয়ে নাও। পরশু ক্লাস এইটের সঙ্গে তোমাদের ম্যাচ। আমি দেখতে চাই তখন বিশুও খেলছে।'

পল্টু মাথা নামিয়ে বলল, 'সেটা হয় না স্যার। বিশু খেললে আমরা কেউ খেলব না।'

স্যার রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'খেলবে না মানে। তোমাদের তো খুব সাহস বেড়েছে দেখছি।' কিছুক্ষণের মধ্যে গলা নামিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে তোদের? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বিশুর সঙ্গে সকলের ঝগড়া হয়েছে নাকি? খুলে বল তো।'

স্যারকে সব বলা হল। কীভাবে বিশু খেলায় হেরে যাওয়ার পরও হাসে, কীভাবে ক্লাস হারলে হাসে, হাসতে হাসতে বাড়ি যায়, কীভাবে নিজে গোল খেয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, কীভাবে আউট হয়ে যাওয়ার পর দাঁত বের করে মাঠের বাইরে ফিরে আসে, কীভাবে দৌড়ে পিছিয়ে পড়লে মজা পায়—সবই।

সব শুনে বিজয়স্যার অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মনে মনে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন। ছাদের দিকে পিটপিট করে তাকালেন। তারপর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'না, বিষয়টা সত্যি খুব জটিল। জিতলে হাসে আমি জানি, কিন্তু হারলে কেন হাসবে? হারার মধ্যে হাসির কোন এলিমেন্ট আছে? হারলে তো কাঁদার কথা? এতদিন ধরে গেম টিচারের কাজ করছি। কত খেলা করলাম, কত খেলা দেখলাম। এরকম তো শুনিনি কখনও! বিশু ছেলেটার মাথায় একটু গোলমাল আছে সেটা আমরা সব মাস্টারমশাই জানি। কিন্তু এখন

দেখছি গোলমাল একটু নয়, গোলমাল খুব বেশি।'

সুকল্যাণ বলল, 'তাহলেই বলুন স্যার, এরপর ওকে দল থেকে বাদ দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল? কাজটা করে আমাদের খুবই দুঃখ হয়েছে। আমরা ওকে প্রত্যেকে খুব ভালবাসি। খেলাধুলোয় ও আমাদের ক্লাসের গর্ব, স্কুলের গর্ব। কিন্তু এই ঘটনার পর ওকে বাদ না দিয়ে আমাদের কী উপায় ছিল?'

প্রসূন বলল, 'ক্লাস সেভেন সব খেলায় হারতে পারে স্যার, কিন্তু প্রেস্টিজ বলে তো একটা জিনিস থাকবে। সেটায় তো হার মেনে নেওয়া যায় না।'

বিজয়স্যার বললেন, 'কখনই নয়। তোদের মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে বিশু হার জিতের ব্যাপারটাতেই একটা গোলমাল পাকিয়ে দিচ্ছে। এই পাগলামি যদি সংক্রামিত হয় তাহলে কেলেঙ্কারি। এবার থেকে হেরে গিয়েও সবাই ধেই ধেই করে নাচবে। নিজে গেম টিচার হয়ে আমি এই বেনিয়ম কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। না, নো নেভার।' এতদূর বলে বিজয়স্যার হাঁপ নিলেন। নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু পরশুদিনের খেলাটার কী হবে? এরকম সময় যদি তোরা দু-তিন ডজন গোলে হারিস আমি তো মুখ দেখাতে পারব না। আচ্ছা, এবারটা কী বিশুকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না? বিশুকে নিলেও তোরা যে হারবি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচ্ছিরি ভাবে হারাটা তো ঠেকানো যেত আর এবারকার মত আমার মুখ কিছুটা রক্ষা পেত।'

সুকল্যাণ, প্রসূন, পল্টু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এর জন্য ওরা তৈরি ছিল না। স্যারের বকাঝকা ঠিক আছে, কিন্তু তা'বলে এভাবে অনুরোধ? তিনজনই খুব লজ্জা পেয়ে গেল। পল্টু আমতা আমতা করে বলল, 'পরশুর খেলাতেও আমরা যে হারব...। আর তারপর যদি বিশু আবার হাসে?'

বিজয়স্যার এবার রেগে গেলেন। গলা তুলে বললেন, 'গাধাটার হাসি আমি বের করছি। ফের যদি হেরে গিয়ে হাসে তাহলে ওকে স্কুল থেকে দূর করে দেব। তাছাড়া এটাই তো ওর শেষ ম্যাচ।'

টিফিনের সময় গাছতলায় আবার জরুরি মিটিং। বিশু স্কুলে

এসেছে, কিন্তু মিটিঙে ডাকা হয়নি। গাছের ডালে বসে পল্টু বিজয়স্যারের কথা সবাইকে বিস্তারিত জানাল। তারপর ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল, 'বন্ধুগণ, কোন উপায় নেই। স্যারের মুখরক্ষার জন্যই আমরা এবারের মতো বিশুকে ফিরিয়ে নিচ্ছি। আবার আমরা হারব এবং বিশু আবার হাসবে। কিন্তু সেটাই ওর শেষ হাসি হবে।'

কার শেষ হাসি, কে হাসে?

সেদিন খেলায় যা ঘটল তা আমরা কল্পনা করতেও পারিনি। গোটা স্কুলের কেউ-ই পারেনি। বাবা, মায়েদের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে থাকা মাস্টারমশাইরা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন। বিজয়স্যার ঘন ঘন নস্যি নিয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘাড়ের কাছে গিয়ে হাঁচতে লাগলেন। এতে হেডমাস্টারমশাইয়ের খুব রেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি রেগে না গিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'বিজয় তোমার নস্যির কৌটোটা একটু দাও তো। এক টিপ নিয়ে ফেলি। এই সময় মাথা পরিষ্কার রাখাটা জরুরি।'

আজকের খেলায় আমরা তিন-এক গোলে ক্লাস এইটকে হারিয়ে দিলাম!

সবাই চলে গেছে। আমরা ক্লাস সেভেনের ছেলেরা মাঠের এককোনায় গোল হয়ে বসে আছি চুপ করে। জিতে এত ঘাবড়ে গেছি যে কথা বলতে পর্যন্ত ভুলে গেছি। সন্ধে হতে আর দেরি নেই। অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

জেতার বিকেল বুঝি এত সুন্দর হয়!

হঠাৎ শুনি ফোঁপানির আওয়াজ। মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটু দূরে বিশু হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে। কাঁদছে নাকি! হ্যাঁ, কাঁদছেই তো! আরে, কাঁদছে কেন? জেতার পর কেউ কাঁদে নাকি! ছেলেটা সত্যি পাগল। হাফটাইমের পরে ও চার চারটে গোল না বাঁচালে আমরা আজ আবার হারতাম।

পল্টু উঠে গিয়ে বিশুর পিঠে হাত রাখল। বলল, 'অ্যাই বিশু, কাঁদছিস কেন? অ্যাই মুখ তোল। মুখ তোল বলছি। কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?'

বিশু মুখ তুলল। চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'কাঁদছি তো তোদের কী? আনন্দ হচ্ছে তাই কাঁদছি। প্লিজ, তোরা আমাকে কাঁদতে দে।'

আমরা ওকে কাঁদতে দিলাম।

এরপর বহু খেলায় আমরা জিতেছি, তেমনি অনেক খেলায় হেরেছিও। বিশু কিন্তু তার স্বভাব বদলায়নি। হেরে গেলে সে একইরকম ভাবে হাসে। তবে আমরা আর রাগ করি না। কারণ, আমরা বুঝতে পেরেছি, হারবার পর হাসা খুব কঠিন কাজ। এই কাজ সবাই পারে না। বিশুর মতো পাগলাটে ধরনের ছেলেরাই কেবল পারে। হারবার পর তারা মোটেও ভেঙে পড়ে না। বরং হাসতে হাসতে তারা নিজের জেদটাকে বাড়িয়ে নেয়। যাতে কোনও না কোনদিন জিতে খুব আনন্দ হয়। এত আনন্দ যে কান্না পেয়ে যায়।

আগুনলাফ

'তোমরা সবাই' ক্লাবঘরে আজ সকাল থেকে ভিড়।

বেলা যত বাড়ছে ভিড়ও তত বাড়ছে। দশটা নাগাদ বাইরে লম্বা লাইন পড়ে গেল। সেই লাইনে যেমন বড়োরা আছে, তেমন হাফপ্যান্ট, ফ্রক পরা ছোটোরাও আছে। তাদের সংখ্যাই বেশি। ক্লাবের পক্ষ থেকে খানিক আগে সেইসব ছোটো ছেলেমেয়েদের হাতে দুটো করে বিস্কুট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সময় যদি বেশি লাগে তা হলে আবার বিস্কুট আসবে। ছোটোরা চাইছে, সময় বেশি লাগুক এবং আবার বিস্কুট আসুক।

ভিড়ের কারণ যারা জানে না তারা অবাক হয়ে ভাবছে, ব্যাপারটা কী? এত মানুষ কেন? 'তোমরা সবাই' ক্লাব তো আর কোনও স্কুল নয় যে ছেলেমেয়ে ভর্তি নেবে, বাচ্চারা সেখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। তবে? ভেতরে কোনও প্রদর্শনী হচ্ছে না তো? তাক্ লাগানো ছবি বা কথা-বলা পুতুলের প্রদর্শনী? হতে পারে। একবার কারা যেন বাঘের ছবি, পোস্টার নিয়ে প্রদর্শনী করেছিল। তখনও খুব ভিড় হয়েছিল। ঘরের ভিতর ঢুকলেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ডাক! ছবি, পোস্টার

দেখার জন্য যত না ভিড় হয়েছিল, বাঘের ডাক শোনার জন্য ভিড় হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি। এবারও সেরকম কিছু হচ্ছে নাকি? হতে পারে। কিন্তু তা বলে এই সাতসকালে প্রদর্শনী! আচ্ছা, টিকা বা রক্ত পরীক্ষার ব্যাপার নেই তো? আজকাল ক্লাবগুলোতে নানা ধরনের স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন হয়। আগের দিন রিকশতে মাইক লাগিয়ে ক্লাবের ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘোষণা করে যায়। সেইরকম কিছু?

যারা ভিড়ের কারণ জানে তারা অবশ্য অবাক হচ্ছে না। বছরের একটা দিন 'তোমরা সবাই' ক্লাবের সামনে এই কাণ্ড হয়। এবার থেকে ছোটোরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা পারে বাবা-মাকে নিয়ে আসে, যারা পারে না একাই চলে আসে। তবে এবারের ঝাঁপানোটা বেশি। তারও কারণ আছে।

আজ 'তোমরা সবাই' ক্লাবে স্পোর্টসের জন্য নাম লেখানোর দিন। সামনেব রবিবার এই এলাকার সব থেকে বড়ো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে। স্কুল মাঠে সারাদিন তুমুল হইচই। এলাহি ব্যাপার। কত রকমের যে প্রতিযোগিতা হবে তার ইয়ত্তা নেই। শুধু দৌড়ই আছে সাত রকমের। একশো মিটার, দুশো মিটার, চারশো মিটার ছাড়াও হবে রিলে দৌড়, বস্তা দৌড়, চামচ দৌড়, ক্যাঙ্গারু দৌড়, অঙ্ক দৌড়। আছে লাফালাফি। হাই জাম্প, লং জাম্প, ফ্রগ্ জাম্প, জিলিপি জাম্প। তা ছাড়া বল ছোড়া, হাঁড়ি ভাঙা, যেমন খুশি সাজো তো আছেই। সকালবেলা শুরু করে শেষ হতে সন্ধে গড়িয়ে যায়। সব থেকে বড়ো কথা হল, প্রাইজগুলো সব লোভনীয়। 'তোমরা সবাই' ক্লাব স্পোর্টসের সময় দামি প্রাইজ দিয়ে এলাকায় বিরাট নাম করেছে। প্রাইজের ব্যাপারে কেউ তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না। এ বছর তো আরও পারবে না। কারণ, এবার খুব বড়ো একটা কম্পিউটার কোম্পানিকে ধরা হয়েছিল। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নিজে এ ব্যাপারে খাটাখাটনি করেছেন। দিনের পর দিন কম্পিউটার কোম্পানির অফিসে গেছেন। ওরা প্রথমে রাজি হচ্ছিল না, পরে রাজি হয়েছে। বলেছে সবকটা ফার্স্ট প্রাইজ তারাই দেবে একটা করে কম্পিউটার।

কাল সন্ধেবেলা এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে। সেই কারণেই এবার

ভিড় বেশি।

ঘরের ভেতরে ক্লাবের সবাই আছে। পটল, গুঞ্জন, বিধানদা, অশোক, ঋদ্ধি মাইতি, সন্তোষদা, আনিসুর। এমনকি ক্লাব প্রেসিডেন্ট পরিতোষবাবুও এসেছেন। চেয়ার টেনে বসে নজর রাখছেন। মোট ছ'টা টেবিলে নাম লেখার কাজ চলছে। বিধানের টেবিলে ঝগড়া হচ্ছে। বাবা-মায়েরা চাইছে, তাদের ছেলেমেয়েরা সব ইভেন্টেই নাম দিক। একটা যদি লেগে যায়। কম্পিউটার পাওয়া চাট্টিখানি কথা। বিধান তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে। যে ছেলে দৌড়ে ভালো সে ছেলে হাঁড়ি ভাঙাতে যে ভালো করবে তার কী মানে আছে? অথবা যে মেয়ে জিলিপি রেসে অংশ নিচ্ছে, তার বস্তা দৌড়ে ঢুকে লাভ কী? বড়োরা শুনছে না।

যেমন মালিনীদেবী। তিনি ঝগড়া শুরু করেছেন।

"আপনি জানেন, আমার ছেলে হাঁড়ি ভাঙায় কত বড়ো চৌখস? জানেন আপনি!"

বিধান অবাক হয়ে বলল, "হাঁড়ি ভাঙায় আবার চৌখস হওয়ার কী আছে! আন্দাজ মিললে জিতবে, নইলে হবে না।"

মালিনীদেবী বললেন, "কে বলেছে আন্দাজ? হাঁড়ি ভাঙার জন্য বিল্টু কতদিন বাড়িতে প্র্যাকটিশ করছে আপনি খবর রাখেন?"

বিধানের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়।

"হাঁড়ি ভাঙার জন্য প্র্যাকটিস! বাড়িতে কী সে হাঁড়ি ভাঙছে?"

"বাড়িতে হাঁড়ি ভাঙবে কেন? চোখ বেঁধে হাঁটাহাঁটি করছে।"

বিধান আর্তনাদ করে উঠল, "সর্বনাশ! বলেন কী! চোখ বেঁধে হাঁটাহাঁটি তো ভয়ংকর। টেবিল, চেয়ারে ধাক্কা খাবে।"

"খেলে খাবে। জিততে গেলে অমন একটু-আধটু ধাক্কা খেতেই হয়। আমরা ফ্ল্যাটের একটা ঘর ছেলের প্র্যাকটিসের জন্য ফাঁকা করে দিয়েছি। নিন, আপনি বিল্টুর নাম লিখুন।"

ঝগড়া শুনে পরিতোষবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন, "বিধান, তুমি নামটা লিখে নাও। উনি যখন এত করে বলছেন।"

বিরক্ত বিধান গজ্‌গজ্ করতে করতে হাঁড়ি ভাঙার খাতা খুলে

বলল, "নিন, নাম ঠিকানা বলুন।"

বিধানের রাগটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। খানিক আগে অধ্যাপক সৃঞ্জয় দেবনাথও একই কাজ করে গেছেন। তিনি তার সাত বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ফুটফুটে সেই মেয়ের নাম রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতী কিছুতেই অঙ্ক দৌড়ে নাম দেবে না। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "বাবা, আমি শুধু জিলিপি রেসে যাব। আমি অঙ্ক পারি না।"

সৃঞ্জয়বাবু সবার সামনেই মেয়েকে ধমক দিলেন, "চুপ কর্। তোর মা যদি শোনে অঙ্কতে নাম দিসনি তোর পিঠ ভেঙে দেবে।"

ছোটোরা যারা একা এসেছে তাদের নিয়ে সমস্যা নেই। তারা নিজের পছন্দমতো প্রতিযোগিতাতেই নাম লেখাচ্ছে।

গুঞ্জন কাজ করছিল মাথা নামিয়ে। সে 'তোমরা সবাই' ক্লাবের ক্যাশিয়ার। চমৎকার ছেলে। তার কাজকর্মও খুবই গোছানো। আজও খাতায় পরপর লাইন টেনে নিয়েছে। প্রথমে প্রতিযোগিতার বিষয়, তারপর নাম, ঠিকানা, বয়স। সে বলে রেখেছে, "আমি বাবা-মায়েদের সামলাতে পারব না। যে সব ছেলেমেয়ে একা এসেছে, তাদের এই টেবিলে পাঠিয়ে দাও। আমি নাম লিখে নিচ্ছি।"

খাতার ওপর ছায়া দেখেই গুঞ্জন বুঝতে পারল, সামনে একটা ছোটো ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুখ না তুলেই গুঞ্জন বলল, 'কীসে নাম দিবি?"

"লাফ।"

"কোন লাফ।"

"লম্বা লাফ।"

"'লম্বা লাফ!"

লঙ জাম্পকে যে বাংলায় লম্বা লাফ বলা যেতে পারে এমনটা জানা ছিল না গুঞ্জনের। সে মুখ তুলল। তুলে অবাক হল। এগারো-বারো বছরের যে ছেলেটি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার সাজপোশাকের অবস্থা একটু খারাপ বললে কম বলা হবে। খুবই খারাপ। এই শীতে গায়ে সোয়েটার নেই। রঙ-চটা জামার কলার ফাটা। নীচের দিকে দুটো বোতাম উধাও। ডান কাঁধের পাশটা ছেঁড়া। টেবিলের কারণে হাফ প্যান্টটা পুরো দেখা যাচ্ছে না, তবে কোমরের কাছে

বেল্টের বদলে যে দড়ি বাঁধা সেটা বোঝা যাচ্ছে। মাথা ভর্তি এলোমেলো চুলে জট পাকিয়ে আছে। এই সকালেও গায়ে ধুলো-বালি। সুন্দর বলতে শুধু টানা টানা চোখদুটো আর মুখের হাসিটুকু। ঠোঁটের ফাঁকে বিস্কুটের গুঁড়ো লেগে থাকায় সেই হাসি আরও ঝলমল করছে।

গুঞ্জন ধাঁধায় পড়ল। ছেলেটা কে? যে-ই হোক 'তোমরা সবাই' ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যারা নাম দেয় তাদের সঙ্গে এই ছেলে মোটেই খাপ খায় না। এই এলাকায় সব ধোপদুরস্ত মানুষের বসবাস। সবাই যে বিরাট বড়োলোক এমন নয়, তবে একেবারে ফালতু নয়। ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরা কেউ স্কুল কলেজের মাস্টারমশাই, কেউ সরকারি চাকুরে। বড়ো অফিসার, ইঞ্জিনিয়ারও আছে। দুজন নাম করা লেখক, একজন চিত্রকরও এখানে থাকেন। ক্লাবের নানা অনুষ্ঠানে তারা বিশেষ অতিথি হন। এই ছেলে কোথা থেকে এল! শুধু এলও না, একে ক্লাবের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কীভাবে নেওয়া যাবে?

"নাম কী তোর?"

টানা টানা চোখের ছলে তার হাসি চওড়া করে বলল, 'ঘুলঘুলি।'

বলে কী ছেলেটা! ঠাট্টা করছে নাকি? গুঞ্জন ভুরু কুঁচকে বলল, "কী নাম বললি?"

"ঘুলঘুলি। মায়ে বলেছে, আমি যে ঘরে জন্মেছি, সেখানে নাকি জানলা-টানলা কিছু ছিল না। শুধু একটা ঘুলঘুলি ছিল। সেই জন্য আমার নাম ঘুলঘুলি। হি হি।"

কথা শেষ করে ছেলেটা এমন বুক টান করে দাঁড়াল যেন নামের ব্যাখ্যা করতে পেরে খুবই খুশি! গুঞ্জনের মজা লাগল, আবার চিন্তাতেও পড়ল। ঘুলঘুলি নামের কোনও বালককে কি ক্লাবের স্পোর্টর্সে নামানো উচিত হবে? 'তোমরা সবাই' ক্লাবের একটা মানমর্যাদা বলে ব্যাপার আছে। মাইকে কী ঘোষণা করা হবে?

"শ্রীমান ঘুলঘুলি তুমি যেখানেই থাক মাঠের ভেতর চলে এসো, তোমার ইভেন্ট এখনই শুরু হবে।"

মাঠ জুড়ে তো হাসির তুফান উঠবে। তারওপর এই ছেলের পোশাকের অবস্থা শোচনীয়। এর নাম লেখাটা কি ঠিক হবে?

গুঞ্জন বলল, "ঘুলঘুলি, তুই থাকিস কোথায়?"

ছেলেটা হাত তুলে বলল, "উই যে ব্রিজ হচ্ছে, ওর নীচে।"

গুঞ্জনের দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল। ঠিকই আন্দাজ করেছে সে। একেবারেই রাস্তার ছেলে।

"বাবা-মার সঙ্গে থাকিস?"

"বাবা থাকে না, মায়ে থাকে।"

গুঞ্জন পথ খুঁজছে। যা কিছু করতে হবে ভেবেচিন্তে করতে হবে।

"মা কী করে তোর?"

"তিন মাস হল এয়েচি। এর আগে ছিলাম ডানকুনি। ডানকুনিতে তখন রাস্তায় পিচ হচ্ছিল।"

"রাস্তায় পিচ্ হচ্ছিল তো তোর কী?"

ঘুলঘুলি ফিক্ করে হাসল।

"ওমা! আমার কী মানে! মায়ে রাস্তা তৈরির সময় পিচ্ ঢালে না? সারাদিন আগুন আগুন পিচ্ ঢালে আর আমি লম্বা লম্বা লাফ মেরে পার হই। হি হি। একটু ভুল হলেই! ঝপাস্—এক্কেবারে আগুনের মধ্যি পড়বে। আমি পড়ি না। হি হি। সেই কারণেই তো তোমাদের লম্বা লাফে নাম দিব।"

গুঞ্জন এবার নড়েচড়ে বসল। ভয়ংকর! এই ছেলে বলে কী! আগুন গরম পিচ্ টপকাতে টপকাতে লঙ জাম্পে এক্সপার্ট হয়ে গেছে! কেমন এক্সপার্ট? কতটা লাফাতে পারে? ছেলেটাকে একবার চান্স দিলে কেমন হয়? ঝক্ঝকেদের মাঝখানে একটা ভিখিরি ধরনের ছেলে ঢুকে পড়লে কে বুঝতে পারবে? কেউ পারবে না। খেলার মাঠে ধুলোকাদা তো সবার গায়েই থাকবে। একটা নতুন প্যান্ট আর সাদা গেঞ্জি দরকার। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সে নিজে যখন ক্যাশিয়ার, ক্লাবের ফান্ড থেকে ওই কটা টাকা বের করে নেওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। সব মিলিয়ে ঘটনাটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হত। তবে এত বড়ো ঝুঁকি নিজে নেওয়া যাবে না। কথা বলে নিতে হবে। ক্লাব তার একার নয়। ক্লাবের মানমর্যাদাও তার একার নয়। তবে এইটুকু সে একা-একাই বুঝতে পারছে, এই ছেলেকে নেওয়া উচিত। গরম পিচ্ টপকে যে ছেলে লাফাতে শেখে সে চাট্টিখানি ছেলে নয়।

গুঞ্জন হেসে বলল, "একটু দাঁড়া ঘুলঘুলি। ভেবেছিলাম,

ছোটোদের নাম লেখায় ঝামেলা হবে না। কিন্তু তুই আমাকে ঝামেলায় ফেললি।”

এরপর গুঞ্জন ক্লাব প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে ঘটনা জানাল। মুচকি হেসে গলা নামিয়ে বলল, “কী করব দাদা? নিয়ে নেব? থাকুক না, অসুবিধে কী?”

পরিতোষবাবু চমকে উঠলেন। চোখ কপালে তুলে বলল “খেপেছ নাকি? ক্লাবের একটা প্রেস্টিজ আছে-না? রাস্তার ছেলেরাও ‘তোমরা সবাই’ ক্লাবের স্পোর্টসে যোগ দিচ্ছে শুনলে কী হবে বুঝতে পারছ না? ভদ্রলোকের ছেলেরা সব থাকবে... তার ওপর অত বড় একটা কম্পিউটার কোম্পানি এবার আমাদের প্রাইজ স্পনসর করছে। তারা কী মনে করবে? ওরা আর কোনওদিন আমাদের কোনও অনুষ্ঠানে টাকা দেবে ভেবেছ?”

গুঞ্জন অবাক হয়ে বলল, “কেন? দেবে না কেন? প্রাইজের সঙ্গে ভদ্রলোক, গরিবলোকের কী আছে? যে জিতবে সে-ই পাবে।”

পরিতোষবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, “আঃ আস্তে বলো, গুঞ্জন। সবাই শুনতে পাবে। তোমার ওই ঘুলঘুলি না দরজার খিল যদি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যায়?”

গুঞ্জন হেসে ফেলল। বলল, “পেলে পাবে।”

প্রেসিডেন্ট ধুতির কোঁচা ঠিক করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, “পাবে! তারপর? তারপর কী হবে? কম্পিউটার কোম্পানির মালিক ওর হাতে একটা লাল ফিতে বাঁধা বাক্স তুলে দেবে? বলবে, যাও বাছা, ওটা ব্রিজের তলায় রেখে এস? অসম্ভব। ইমপসিবল।”

গুঞ্জন এবার মনে মনে রেগে গেল। এ কেমন যুক্তি!

“আর একবার ভেবে দেখুন দাদা। একটা ছোটো ছেলেকে ছেঁড়া জামার জন্য স্পোর্টস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে?”

পরিতোষবাবু স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, “দরদ দেখাচ্ছ?”

গুঞ্জন দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, “দরদ দেখাচ্ছি না, একজনকে বাকিদের মতো সুযোগ দিতে চাইছি।”

“সেটা সম্ভব নয়। এটা আমার ডিসিশন।”

রোখ চেপে গেল গুঞ্জনের। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, “শুধু

আপনার ডিসিশনে হবে না। আজ সন্ধেতে মিটিং ডাকুন। ক্লাবের মেম্বাররা কী বলছে সেটাও শুনুন।"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে পরিতোষবাবু বললেন, "তাই হোক।"

গুঞ্জন ফিরে এসে ঘুলঘুলিকে বলল, "আজ পালা। কাল সকালে একবার আসিস। তোর নাম লিখে নেব।"

ধুলো মাখা মুখ আর টানা টানা চোখে হেসে ঘুলঘুলি পালাল।

নাম কিন্তু লিখতে পারল না গুঞ্জন। এমন হবে সে ভাবতেও পারেনি। বিকেলের মিটিং-এ সকলেই আপত্তি করল। কেউ বলল, ব্রিজের তলায়-থাকা ছেলেকে সঙ্গে নিলে অন্য বাবা-মায়েরা রেগে যাবে। কেউ বলল, রেগে না গেলেও ক্লাবের দুর্নাম। কেউ বলল, দুর্নাম ছড়ালে পরের বার থেকে আর কম্পিউটার, পোটাটো চিপ্‌স, কোল্ড ড্রিংক্স টাকা দেবে না। স্পোর্টস বন্ধ করে দিতে হবে। সেটা একরকম আত্মহত্যা। সামান্য একটা দশ-বারোর বছরের ছেলের জন্য ক্লাবের এত উৎসব বন্ধ করে দেওয়া যায় না। গুঞ্জন অবাক হয়ে বলল, "তাহলে ক্লাবের নাম আর মিছিমিছি 'তোমরা সবাই' রাখা কেন? এই নাম বদলে করে দেওয়া হোক 'তোমরা ক'জন'।"

প্রেসিডেন্ট হাসি মুখে সবটা শুনলেন। তারপর ধুতির কোঁচা ঠিক করতে করতে বললেন, 'আহ্, রাগ করো কেন, গুঞ্জন? এরপরে না হয় আমরা আলাদা করে পথশিশুদের জন্য একটা কিছু করব। এই ধরো, বসে আঁকো বা ফুটবল ধরনের কিছু একটা।"

পরদিন আবার ঘুলঘুলি এল। ফাঁকা ক্লাবঘরের এক কোনায় বসে কী যেন লিখছিল গুঞ্জন।

"কী হল কাকু? আমার নাম লিখবে না?"

গুঞ্জন শুকনো হেসে ঘুলঘুলির এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "লেখা হয়ে গেছে রে ঘুলঘুলি। তবে খাতায় নয়, আমি তোর নাম লিখেছি অন্য জায়গায়।"

ঘুলঘুলি হেসে ঘাড় কাত করল। বলল, "তা হলেই হবে।"

ঘুলঘুলি চলে যাওয়ার পর দ্রুত হাতে ক্লাবের সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়ার চিঠিটা শেষ করল গুঞ্জন।

'পরিতোষদা, আমাকে ক্ষমা করবেন। সকলের যেমন আপত্তি

আছে, তেমন আমারও একটা প্রতিবাদ আছে...।’

রবিবার সকাল থেকেই স্কুলমাঠ জমজমাট। গোটা এলাকার মানুষ ভেঙে পড়েছে ‘তোমরা সবাই’ ক্লাবের স্পোর্টস দেখতে। রঙিন পতাকা, কাগজের চেন, সাদা চুনের দাগে মাঠ সেজেছে। সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা সাদা জামা, প্যান্ট, ফ্রকে ফুর্‌ফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুকে পিঠে নম্বর লেখা কাগজ। একদিকে সামিয়ানা। লম্বা টেবিলে থরেথরে সাজানো প্রাইজ। পাশেই ঝকঝকে কম্পিউটারের বাক্স। মাইকে একটার পর একটা ঘোষণা চলেছে। সেই অনুযায়ী চলছে প্রতিযোগিতা। মাঠের পাশেই চেয়ারে বসেছে বাবা-মায়েরা। তাদের টেনশন দেখার মতো। কেউ ঘাম মুছছে, কেউ ঘনঘন জল খাচ্ছে। এই টেনশন চলবে সারাদিন।

খানিকটা দূরে ব্রিজের ওপর আজও নতুন রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। বিছোনো হচ্ছে পাথরকুচি। বড়ো বড়ো কালো ড্রামে আগুন জ্বেলে গলানো হচ্ছে পিচ। পুরুষ মহিলারা দল বেঁধে সেই পিচ ঢেলে দিচ্ছে পথে। গর্‌গর্‌ আওয়াজ তুলে দৈত্যের মতো চলে যাচ্ছে রোলার। জমাট লাল গলন্ত পিচ যেন আগ্নেয়গিরির লাভার মতো!

বড় ভয়ংকর কাজ করছে একটা ছোটো ছেলে। সেই আগুন লাফ দিয়ে দিয়ে টপকে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে! এগিয়ে যাচ্ছে! সবাই বারণ করছে, বকছে। মলিন পোশাকের ছেলেটা কিন্তু শুনছে না। হাসছে খিলখিল করে।

হাসবে না? তার আগুনলাফের খেলা দেখতে আজ কে এসেছে দেখতে হবে তো।

মুগ্ধ গুঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। ঘুলঘুলির প্রতিটা লাফের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিচ্ছে। ফিসফিস করে বলছে, “আরও জোরে, আরও জোরে লাফ দে বেটা।”

বড়ো কিছু নয়, এই ছেলের জন্য ছোট্ট একটা প্রাইজ এনেছে গুঞ্জন।
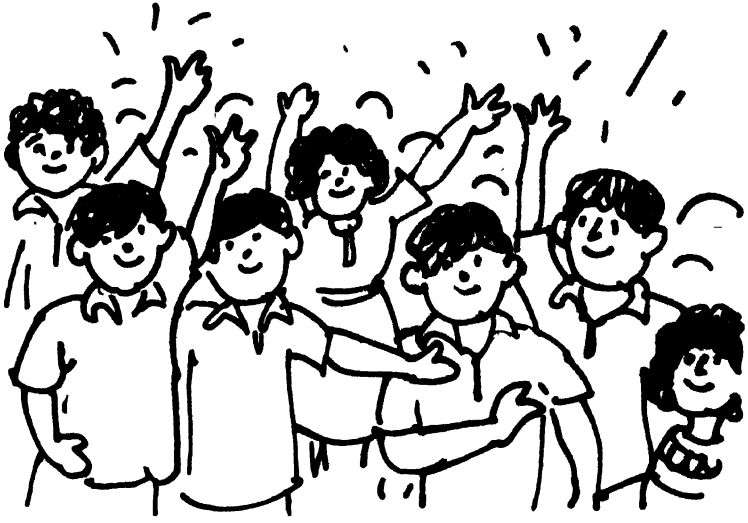
একমত

এই অঞ্চলে একটাই বড় স্কুল। এই পবনপুরে। এদিকে দু'স্টেশনের মধ্যে এত বড় স্কুল আর নেই। এ হল যাকে বলে সেই হাই স্কুল। একেবারে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত। আমরা যারা পবনপুরে থাকি তারা তো এই স্কুলে পড়িই, এমনকি আশপাশে অনেক দূর দূর জায়গা থেকেও ছেলেরা সব আসে। স্কুল নিয়ে আমাদের খুবই গর্ব। আমাদের যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, 'কি খোকা, কোন স্কুলে পড়?' তখন আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, হাতদুটো পেছনে নিয়ে, বুক টান টান করে বলি, 'পবনপুর স্বাধীনতাসংগ্রামী শহিদ শ্রীমতী চারুবালা দাসী স্মৃতি বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় ব্র্যাকেটে সরকার অনুমোদিত'। অনেকেই বলেছেন, 'স্কুলের নাম বলছ তো ওরকম অঙ্গভঙ্গি করছ কেন? আমাদের তাতে কিছু এসে যায় না। আমাদের ড্রিল স্যার এ রকমই শিখিয়ে দিয়েছেন।'

স্কুল আমাদের একেবারে নতুন। বছর তিনেক আর এমন কী? তবু এর মধ্যেই একদম জমজমাট। কোন ক্লাসে আর একটি সিটও ফাঁকা নেই। তাও রোজ যে কত ছেলে ভর্তির জন্য আসে তার কোন

ঠিক নেই। বড় পরীক্ষায় স্কুলের রেজাল্টও খুব ভাল হয়। এই তো এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় আটানব্বইজন ছাত্রের মধ্যে দশজন ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে, দুজন পেয়েছে স্টার নম্বর। এইজন্য স্কুল একদিন টুনিবাল্ব দিয়ে সাজানো পর্যন্ত হয়েছিল। আমাদের স্কুলে খেলাধুলো হয়, অ্যানুয়াল ফাংশন হয়, হাতে লেখা ম্যাগাজিন বের হয়। এইরকম স্কুল নিয়ে পবনপুরের মানুষ গর্ব করবে না তো কী করবে? অথচ স্কুলটা হবে কি না তা নিয়ে কতই না সংশয় ছিল। চিন্তায় কত রাত আমাদের ঘুম হয়নি। আজ যারা এই স্কুল নিয়ে গর্ব করে তাদের কতজনই না সেদিন চেষ্টা করেছিল স্কুলটা যাতে না হয়। আমরা ছোটরা, মানে পিন্টু, সুমন, শুভাশিস, মানস, রথীন, পার্থ, দেবু, কৃষ্ণেন্দু, প্রতীম, অর্ণব, পিনাকী, অনুপমরা যদি তখন একজোট না হতাম তাহলে কি পবনপুরে এতবড় স্কুলটা হত? মোটেই না।

তাহলে বলি—।

শিবপদ ভট্টাচার্য যখন পবনপুর কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তখনই বলেছিলেন, "হবে, একটা কিছু হবেই। জিতে নিই। পবনপুরের জন্য ঠিক কিছু একটা করে দেব।" ভোটে জিতে এম এল এ হয়ে শিবপদবাবু সে কথা মনে রেখেছেন দেখে দাদা, বাবা, কাকারা অবাক হল। পাড়ার বড়রা বলাবলি করতে লাগল, "অবাক কাণ্ড! শিবুটার হল কী? জিতে গেছে তাই কিনা বলছে কথা রাখব? প্রতিশ্রুতি রাখব? মাথা খারাপ হল নাকি? যে যাই বলুক না কেন, এক রোববার সন্ধেবেলা বাজারের মোড়ে এম এল এ সাহেব মিটিং ডাকলেন। বড়রা গেল, আমরাও পেছন পেছন গেলাম। মাইকে ধরা ধরা গলায় শিবপদবাবু বললেন, "পবনপুর কথা রেখেছে। আমাকে জিতিয়েছে। আমিও কথা রাখব। এবার আপনারা বলুন, পবনপুরের জন্য কী চান? একটা সিনেমাহল না একটা বিরাট ক্লাবঘর, না একটা সুইমিং পুল? আপনারা নিজেরা ঠিক করে সাতদিনের মধ্যে জানান।"

ব্যস্, এরপর যা হওয়ার তাই হল। ঘরে ঘরে ঝগড়া লেগে গেল। মা, মাসি, পিসি, জেঠি, দিদিরা বলতে লাগল সিনেমাহলই চাই। কাছাকাছি ভাল কোন হল নেই। বাবা কাকারা চায় ক্লাবঘরটাই হোক। সন্ধের পর তাস, দাবা খেলা যাবে। দাদার বয়সী যারা তারা ঝুঁকছে

সুইমিং পুলের দিকে। এই নিয়ে আলোচনা ঝগড়া এমনকি ছোটখাট মারপিট পর্যন্ত হল। সাতদিন কেটে গেল, দশদিন কেটে গেল কোন সিদ্ধান্তই হল না। এইরকম সময় একদিন বিকেলে ফুটবল খেলার মাঠে পিন্টু বলল, "দেখ, ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। আমরা কি পবনপুরের কেউ নেই?" দেবু বলল, "ঠিকই। পবনপুরে আমাদের জন্য কি কিছু হতে নেই? বড়রাই কি সব?"

কৃষ্ণেন্দু বলল, "চল আমরাও এম এল এ-র কাছে যাই। কিন্তু কী চাইবি?"

মানস বলল, "সবথেকে ভাল হয় আমরা যদি একটা স্কুল চাই। তাহলে আর আমাদের কষ্ট করে দূরে যেতে হবে না।"

অনুপম বলল, "সেটাই ভাল। এক স্কুলে আমরা বেশ সবাই মিলে পড়তে পারব। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেতে হবে না।"

'হুররে' বলে লাফিয়ে উঠলাম সক্কলে। পরদিন ভোর না হতেই আমরা একেবারে শিবপদ ভট্টাচার্যের বাড়ির দরজায়। আমরা সবাই চাই একটা স্কুল। আমরা, ছোটরা সবাই একমত। এরপর সত্যি সত্যিই একদিন পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে বড় মন নিয়ে দলে দলে ছোটরা এসেছিল। আর অনেক ছোট মনের বড়রা সিনেমা হল, ক্লাব আর সুইমিং পুল হল না বলে রাগ করে এলই না।

ঢাকের বাদ্যি

আমাদের ক্লাবের দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে প্রতিবারই যে লোকটা ঢাক বাজাতে আসত তার নাম নটুরাম নট্ট। বড়রা নটু বলে ডাকত। আমরা বলতুম নটুদা। নটুদা প্রথম কবে আমাদের ক্লাবে ঢাক বাজাতে এসেছিল আমাদের তা মনে নেই। সত্যি কথা বলতে কী সেকথা কেউই জানে না। সবাই শুধু জানে যে আমাদের পুজোতে নটুদাই ঢাক বাজাবে।

নটুদাকে কিছু বলতে হয় না। ষষ্ঠী পুজোর দিন সেই কাকভোরে সে চলে আসত। আমরা বাড়ি থেকেই শুনতে পেতাম ঢাক বাজাচ্ছে।

কাইনাড়া কাইনাড়া গিজগিনতা গিজগিনতা।

ব্যস্, আমরা ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তাম। হুর্‌রে। পুজো এসে গেছে! যেন নটুদাই এসে ঠিক ভোরবেলা আমাদের জানিয়ে দিত, দুর্গাপুজো শুরু হয়ে গেছে! তাই নটুদা ছাড়া আমরা পুজোর কথা ভাবতেই পারতাম না।

কিন্তু নটুদার একটা বিচ্ছিরি স্বভাব ছিল। প্রতিবারই সে নিজের গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের এখানে কিছু না কিছু ফেলে যেত। এই যেমন গামছাটা, জামাটা, ঢাক পেটাবার কাঠি দুটো। কখনও আবার

যে টাকাটা ওকে দেওয়া হত সে টাকাটাই হয়তো পড়ে থাকতো। একেক বছর একেকটা জিনিস। আমরা ক্লাবের ছেলেরা জানতাম, নটুদা কিছু না কিছু ফেলে যাবেই। দশমীর দিন গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে এসে আমরা নটুদার ফেলে রাখা জিনিস যত্ন করে ক্লাবঘরে তুলে রাখতাম। আবার পরের বছর পুজোর সময় নটুদার হাতে তুলে দিতাম। এরকমই চলছিল। নটুদাকে যখন বলতাম, তখন সে হাসতে হাসতে বলত, 'ওটা তো তোমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলাম'।

বছরের পর বছর এরকম চলতে লাগল। আমরা বড় হয়ে গেলাম। বড়রা আরও বড় হয়ে গেল। অনেকে দূরে দূরে চলে গেল। তবে আমাদের ক্লাবের পুজোটাও রইল, আর রইল ঢাকী নটুদা। অনেক কিছু বদলালো কিন্তু নটুদার জিনিস ফেলে দেওয়ার স্বভাব বদলালো না। একবছর তো ঢাকটাই নটুদা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। আমরা ওকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'কি নটুদা ঢাকটাও কি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলে'?

গত দু'বছর হল নটুদা আর আমাদের ক্লাবের পুজোতে আসছে না। শুনেছি নটুরাম নট্ট নাকি মারা গেছে। সে আর আশ্চর্যের কথা কী? বয়স তো হয়েছিল। আমরা খবরটা শুনে দুঃখ পেয়েছিলাম। তবে নটুদার একটা রাখা জিনিস এখনও আমাদের পুজো প্যান্ডেলে রয়ে গেছে। কী সেটা? ঢাকের বাজনাটা। ওটা নটুদা সত্যি আমাদের জন্য রেখে গেল।

এরোপ্লেন

ক্লাস এইটের পটল প্রামাণিক এবার পুজোর ছুটিতে দিল্লি বেড়াতে গিয়েছিল।

সেটা আসল কথা নয়, আসল কথা হল, সে গিয়েছিল এরোপ্লেনে চেপে। বেড়াতে যাওয়ার থেকে এরোপ্লেনে চাপাই পটলের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। আর সত্যি কথা বলতে কি আমাদের এই পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ে কেউ কখনও এরোপ্লেনে চেপেছে এমনটা শোনা যায়নি। পটল সেই সুযোগ ছাড়ে?

কিন্তু ব্যাপারটা একটু অন্য দিকে মোড় নিল। এরোপ্লেনে একবার চেপেই পটলের যেন সত্যি সত্যি পা মাটিতে পড়ছে না। সে বাড়াবাড়ি শুরু করল। পুজোর ছুটি একমাস বাদে ফুরলো। আমরা সবাই হইহই করে স্কুলে এলাম। পটলও এল। স্কুলে ঢোকার পর থেকে সে এমন একটা ভান করতে লাগল যেন এইমাত্র এরোপ্লেন থেকে নেমেছে। বাচ্চু গিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী রে পটল কেমন বেড়ালি?' পটল আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'দাঁড়া, দাঁড়া হাত-পাগুলো একটু ছাড়িয়ে নেই। অতক্ষণ এরোপ্লেনে থাকলে হাতে পায়ে সব খিল্ ধরে

যায়।' বাচ্চু তো অবাক। সে বলল, 'সে কি রে! তুই তো পনেরো দিন হল ফিরেছিস। এখনও হাত পা ছাড়েনি?' পটল খেঁকিয়ে উঠল, 'মেলা বকিস না তো। এরোপ্লেনে চড়িসনি তো কখনও। তুই পা খিল ধরার কী বুঝবি?'

বাচ্চু এতে যথেষ্ট অপমানিত হয় এবং চলে আসে। অপমানিত হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। অনেকক্ষণ একটানা বসে থাকবার পর বাচ্চুরও অনেকবার হাত পায়ে খিল ধরেছে। হতে পারে সে খিল হয় এরোপ্লেনের নয়, তবু খিল তো।

বাচ্চু গজ গজ করতে করতে এসে পিন্টুকে বলল, 'পটলার বড্ড বাড় বেড়েছে।'

এর কয়েকদিন বাদেই পটলদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় সুশান্তর জন্মদিন ছিল। সে একবাক্স টফি নিয়ে এসে সবাইকে দিচ্ছিল। প্রত্যেকেই হাসিমুখে সেই টফি খেয়ে টফি এবং সুশান্তর ভূয়সী প্রশংসা করছিল। শুধু পটল টফিটা মুখে দিয়ে এমন একটা মুখ করল যেন সে উচ্ছে সেদ্ধ খাচ্ছে। সুশান্ত ব্যতিব্যস্ত হল, 'কী হল পটল?' পটল মুখটা আরও বিকৃত করল, 'না হয়নি কিছু। আসলে এরোপ্লেনের চমৎকার টফি খাওয়ার পর, এসব আর মুখে রোচে না'।

সুশান্তর কান লাল হয়ে গেল। একদিন টিফিনের সময় হঠাৎ দেখা গেল পটল দুকানে তুলো গুঁজে বসে আছে। অনুপম সরল মনে গিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, কানে ব্যথা হয়েছে নাকি? তুলো গুঁজেছিস কেন?' গম্ভীর মুখে পটল বলল, 'বোকার মত কথা বলিস না তো। এরোপ্লেনে চড়বার অভিজ্ঞতা থাকলে এমন কথা বলতিস না। শব্দ আটকাতে এরোপ্লেনের ভেতর আমরা কানে তুলো দিয়ে বসে থাকতাম। টিফিনের সময় এখানে এত হট্টগোল হয় যে ঠিক করেছি এখন থেকে এখানেও কানে তুলো দেব। এরোপ্লেনের শব্দ তাও সহ্য হয়। তোদের চিৎকার চেঁচামেচি তো একেবারে জংলির মত।'

অনুপমের মাথাটা রাগে গরম হয়ে যায়। এইসব পর্যন্ত তাও চলছিল। বন্ধুদের সঙ্গে এসব কথাবার্তায় পটলের কোন বিপদ ছিল না। কিন্তু হায়রে! পটল যে আরও বাড়ল!

ইংরেজিতে পটল বরাবরই দুর্বল। কিন্তু সম্প্রতি এরোপ্লেনে

ভ্রমণের পর সম্ভবত সে সেকথা ভুলতে বসেছে। নিজের মধ্যে সে একটা 'ইংরিজি ইংরিজি' ভাব আনতে চেষ্টা করছে। যেমন মাঝে মধ্যেই সে কারণে অকারণে 'নো থ্যাঙ্কস' বা 'ওকে ফাইন' এর মত দু'একটা কথা বলছে। কেলেঙ্কারিটা হল সেদিন ফোর্থ পিরিয়ডে। মানে ইংরিজি ক্লাসে।

নিকুঞ্জবাবু এসে বললেন, 'সবাই দশ লাইনে পুজোর অভিজ্ঞতা লিখে দেখা দিখিনি।'

আশ্চর্য! সবার আগে খাতা জমা পড়ল পটল প্রামাণিকের! এই প্রথম। শুধু তাই নয়, সেই খাতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিকুঞ্জবাবু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'সবাই শোন, পটল লিখেছে, চেক ইন। টেক অফ। ককপিট। এয়ার হস্টেস্। রান ওয়ে। ল্যান্ডিং। লাগেজ। ব্যস। রচনার নাম দিয়েছে এরোপ্লেন। আর 'চেক ইন'-এর 'ইন' ছাড়া সব বানান ভুল। 'হুম্', বলে বসে পড়লেন নিকুঞ্জবাবু। রাগ তাঁর চোখে নাকে। 'এদিকে আয় পটল।' পটল হাসি হাসি মুখে উঠে গেল।

এরপর পটলের খাতায় নিকুঞ্জবাবু বড় বড় করে লিখে দিলেন, 'এ ই আর ও পি এল এ এন ই'। বললেন, 'যা এক হাজার বার লিখে নিয়ে আয়।'

এই ঘটনার পর পটল আমাদের কুতুবমিনার, লালকেল্লা নিয়ে অনেক গল্প বলেছে, কিন্তু এরোপ্লেন নিয়ে কখনও একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

ডাকনাম

সাতদিনে পাঁচটা ঘটনা। তিনটে মারাত্মক, দুটো ভয়াবহ। এরপরই হেডস্যার নোটিশ দিলেন। নতুন নিয়মের নোটিশ। আমাদের স্কুলের নোটিশ বোর্ডে একটা মুশকিল আছে। বোর্ডটা একটা বাক্সের মতো। সামনে কাঁচের ঢাকনা। বোর্ডে নোটিশ লাগিয়ে সেই ঢাকনা আটকে দিতে হয়। তারপর টিপ্ তালা সিস্টেম। মাস তিনেক হল ঢাকনার কাঁচের নিচে লম্বা একটা দাগ পড়েছে। আঁচড়ের মতো দাগ। পিওন দিবাকরদা অনেক ঘষেও সেই দাগ তুলতে পারেনি। ফলে নোটিশের কোনও কোনও লেখা অনেক সময় সেই দাগের আড়ালে পড়ে যায়। আর তখনই মুশকিলটা হয়। আড়ালের লেখা পড়া যায় না। কোন লেখাটা দাগের আড়ালে পড়বে আগে থেকে বোঝা কঠিন। বড় বড় পিন দিয়ে নোটিশ আটকে, কাঁচের দরজা বন্ধ করার পর বোঝা যায়। যেমন হেডস্যারের এই নোটিশে ঢাকা পড়েছে শেষ লাইনটা। বেশিরভাগ সময়ই শেষ লাইনে গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকে না। এবারে কিন্তু আছে। নতুন নিয়ম লেখার পর, শেষ লাইনে হেডস্যার লিখেছেন, নিয়ম না মানলে কী শাস্তি হবে। আমরা, স্কুলের ছেলেরা, নিয়ম জানলাম, নিয়ম ভাঙার শাস্তি জানতে পারলাম না।

সে যাই হোক, হঠাৎ করে স্কুলে একটা নতুন নিয়ম কেন চালু করতে হল? সবকটা ঘটনা না বলে শুধু মারাত্মক তিনটে বললেই এর কারণ বোঝা যাবে।

প্রথম ঘটনা অপলককে নিয়ে। অপলক বিশ্বাস।

ক্লাস এইটের এই ছেলে শুধু নামে সুন্দর নয়, স্বভাবেও সুন্দর। সুন্দর আর শান্ত। নামের সঙ্গে মিলিয়ে চোখদুটো বড় বড়, চুল কোঁকড়ানো। মারপিট দূরের কথা, কারও সঙ্গে তার ঝগড়া পর্যন্ত নেই। যদি বা ছোটখাটো রাগারাগি হয়, নিজেই মিটিয়ে ফেলে। যার সঙ্গে গোলমাল, টিফিনের সময় তার কাঁধেই হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছুটির পর পোটাটো চিপস্ কিনে বলে, "এই নে, তুই আগে প্যাকেট খোল।"

সোমবার সেই ছেলেই মারাত্মক একটা কাণ্ড করে বসল!

থার্ড আর ফোর্থ পিরিয়ডের মাঝখানের সময়ে পিছনে বসা তুর্যকে লক্ষ্য করে ঘুসি ছুঁড়ল। একটা ঘুষি নয়, পরপর তিনটে ঘুষি! তবে একটাও তুর্যর গায়ে লাগেনি। লাগার কথাও নয়। অপলক ভূগোল, অঙ্ক, ইংরেজিতে যেমন পাকা, কিল চড় ঘুষিতে ঠিক ততটাই কাঁচা। ফলে ঘুষিগুলো খুব সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এদিক ওদিক হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে গায়ে না লাগলেও অপলকের এই রণমূর্তি দেখে তুর্যর মুখ গেল শুকিয়ে। অপলকের সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবা যায়, ঘুষি ভাবা যায় না। শুধু তুর্য নয়, গোটা ক্লাস হতবাক।

আমাদের স্কুলে যে কোনও খবরই খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে করিডোর, বাথরুম এবং লাইব্রেরিতে ছাত্রদের মধ্যে কানাকানি হয়। তারপর সেই খবর একতলা, দোতলা, তিনতলা টপকে, অফিস হয়ে, টিচার্স রুম ছুঁয়ে একেবারে হেডস্যারের ঘরে গিয়ে পৌঁছোয়। সমস্যা একটাই। এতটা পথ পেরোতে গিয়ে 'সত্যি খবর' এর গায়ে অনেক 'মিথ্যে খবর'ও লেগে যায়। এবারও তাই হল। টিফিনের আগেই গোটা স্কুল ঘুষির খবর জেনে ফেলল। শেষপর্যন্ত হেডস্যারের ঘরে খবর যখন পৌঁছোল তখন সেই খবরের অবস্থা ভয়ংকর!

দিবাকর প্রায় ছুটতে ছুটতে হেডস্যারের ঘরে ঢুকল। সে হাঁপাচ্ছে। উত্তেজনায় গলা কাঁপছে তার।

"স্যার, কেলেঙ্কারি কাণ্ড। ভয়ংকর ব্যাপার। অপলক মেরেছে।"

"মেরেছে! কাকে মেরেছে?"

হেডস্যার তখন মন দিয়ে স্যারেদের রুটিন তৈরি করছিলেন। রুটিন তৈরি একটা জটিল কাজ। এই কাজে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সবরকম অঙ্ক লাগে। টেবিল জুড়ে একটা সাদা কাগজ পাতা। এত বড় কাগজ পাওয়া যায় না। বেশ কয়েকটা কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে তৈরি করতে হয়েছে। দিবাকরদাই তৈরি করে দিয়েছে। হেডস্যার একটা স্কেল দিয়ে সেই কাগজে রুল টানছেন। কাগজ বড় হওয়ার কারণে একেবারে রুল শেষ হচ্ছে না। টেবিলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে টানতে হচ্ছে। তিনি ঘোরা বন্ধ করে মুখ তুলে দিবাকরের দিকে তাকালেন। দিবাকরদা বলল, "স্যার অপলক মেরেছে তুর্যকে। তুর্য ঠিক ওর

পিছনেই বসে।"

হেডস্যার ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, "তুমি কোন অপলকের কথা বলছো। ক্লাস এইটের অপলক?"

"হ্যাঁ, স্যার। স্কুলে তো ওই একটিই অপলক। অমন ভাল নাম আর কটা আছে?"

হেডস্যার একটু হাসলেন। বললেন, "তুমি নিশ্চয় ভুল করছো দিবাকর। শুধু নাম নয়, ওই অপলক নিজেও অতি চমৎকার ছেলে। তুমি বোধহয় জানো না এবছর সে গুড কন্ডাক্টের জন্য প্রাইজ পাচ্ছে। তার জন্য দুটো বই পর্যন্ত কিনে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিশু এবং মার্ক টয়েনের হাকলবেরি ফিন্।"

দিবাকর জোর গলায় বলল, "স্যার, খবর পেলাম অপলকের ঘুষিতে তূর্যর নাক ফেটেছে। রক্তপাত হচ্ছে। রক্ত দেখে ইতিমধ্যে ক্লাসের আর দুটি ছেলে জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়েছে স্যার।"

এরপর আর দেরি করা যায় না। হাতে স্কেল নিয়েই তিনতলায় দৌড়োলেন হেডস্যার। চাপা না দেওয়ার কারণে স্যারেদের রুটিন পাখার হাওয়ায় ঘরময় উড়তে লাগল মহানন্দে।

দ্বিতীয় মারাত্মক ঘটনা একটু অন্যরকম। তাতে ঝগড়া বা মারপিট নেই। ফুটবল আছে।

সেদিন ছিল ক্লাস সেভেন আর এইটের ফুটবল ম্যাচ। এমনি ম্যাচ নয়, প্রেস্টিজ ম্যাচ। এর আগে দুটো ম্যাচেই হার হয়েছে সেভেনের। এটাতে জিততেই হবে। গেম টিচার ক্লাস সেভেনের জন্য নতুন গোলকিপার ঠিক করছেন। ঋষভ। ঋষভকে নেওয়ার পরামর্শটা প্রান্তিকের। প্রান্তিক সেভেনের ফুটবল টিমের ক্যাপটেন। ঋষভ শুধু প্রান্তিকের ক্লাসের বন্ধু নয়, পাড়ারও বন্ধু। পাশাপাশি বাড়ি। পাড়ার মাঠে এক সঙ্গে খেলাধুলোও হয়। গেম টিচার ক্যাপটেনের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। রাজি হয়ে ঠিকই করেছেন। নতুন গোলকিপারের পারফরমেনস হাফ টাইম পর্যন্ত দুর্দান্ত। তিনটে অবধারিত গোল বাঁচিয়ে দিল। সেভেন এক গোলে এগিয়ে। জিতব জিতব করছে। গোটা টিম উত্তেজনায় ফুটছে টগবগ করে। আর এমন সময়ই মারাত্মক ঘটনা!

খেলা শেষের বাঁশি বাজার মিনিট দুয়েক আগে সেভেন একটা

গোল খেয়ে বসল। তুখোড় গোলকিপার ঋষভ লাফিয়ে ঝাঁপিয়েও বল আটকাতে পারেনি। পারবে কী করে? গোল যে সেমসাইড। বল এসেছে নিজের দলেরই খেলোয়াড়ের পা থেকে। সেই খেলোয়াড়ের নাম প্রান্তিক। দলের ক্যাপটেন। ক্লাসের সহপাঠী। পাড়ার বন্ধু!

ম্যাচ শেষ হওয়া মাত্র কাদামাখা অবস্থাতেই ঋষভ ছুটল গেম টিচারের কাছে। নালিশ জানাতে। গেম টিচার প্রান্তিককেও ডেকে পাঠালেন। বিচার তো আর এক তরফা হয় না। তবে বিচার কিছু করা গেল না। দু'পক্ষের কথা শুনে গেম টিচার গম্ভীর হয়ে গেলন।

তিন নম্বর মারাত্মক ঘটনা মারাত্মকের থেকেও বেশি। ডবল মারাত্মক।

অন্যদুটো তো তাও স্কুলের মধ্যে আটকে ছিল। এই ঘটনা স্কুলের গণ্ডি টপকে গেল। টপকে চলে গেল বাড়ি পর্যন্ত। আর যাবে না-ই বা কেন? এতদিন ছিল দুজনে দুজনে। এবার হল সিঞ্জন বনাম গোটা ক্লাস টেন। দুদিন সহ্য করার পর সিঞ্জন সেদিন পেট ব্যথা বলে স্কুল থেকে হাফ্ ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেল। পরদিন ফিরে এল বটে, তবে একা নয়, বাবা, মা দুজনকেই সঙ্গে নিয়ে এল। তিনজনেরই মুখ থমথমে। কোনদিকে না তাকিয়ে তারা সোজা ক্লাস টিচারের সঙ্গে দেখা করল।

এরপরই নোটিশ বোর্ডে নিষেধের নোটিশ পড়ল—এখন থেকে স্কুলে ডাকনাম নিষিদ্ধ!

এই নোটিশ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কারণ ভয়ংকর সবকটা ঘটনার পিছনের কারণ একটাই। ডাকনাম।

শান্তশিষ্ট অপলক। সেদিন অশান্ত হয়েছিল এই ডাকনামের জন্যই। সুন্দর নামের এই ছেলেকে বাড়িতে নাকি সবাই ডাকে 'পেঁপে' বলে। এই নামের পিছনে ইতিহাসও আছে। ছেলেবেলায় কেউ সন্দেশ, রসগোল্লার ভক্ত হয়, কারও নজর থাকে চকোলেট, ক্যাডবেরিতে। কেউ পছন্দ করে কেক, পেস্ট্রি, পিৎসা। ফুচকা, বাদাম, চিপসের জন্য পাগল তো সকলে। কিন্তু কোনও রহস্যময় কারণে অপলক ছেলেবেলায় ছিল পেঁপের ভক্ত। এমনি ভক্ত নয় বাড়াবাড়ি রকমের ভক্ত। পেঁপের ডালনা থেকে পাকা পেঁপে কিছুই খেতে বাদ দিত না। সেই থেকে বাড়িতে সবাই তাকে 'পেঁপে' বলে ডাকতে শুরু করে।

একটু বড় হতেই অপলক বুঝতে পারে, এই নাম আগে ঝেড়ে ফেলতে হবে। সে পেঁপে ত্যাগ করল। কিন্তু নাম ত্যাগ করতে পারল না। ডাকনামের এই সমস্যা। ভাল নাম তাও বদলানো যায়। কিন্তু ডাকনাম বদলানো যায় না। মেনে নিতে হয়। অপলকও মেনে নিল। তবে একটা কাজ করল। নামটাকে গোপন করে রাখল। কিছুতেই বাড়ির চার দেয়ালের বাইরে বেরোতে দিল না।

আর সেটাই সেদিন ফাঁস করেছে তূর্য! কোনভাবে সে অপলকের এই 'অতি চমৎকার' ডাকনামটি জানতে পারে এবং পিছনে বসে ফিসফিস করে ডাকতে থাকে।

"পেঁপে, অ্যাই পেঁপে। কী শুনতে পাচ্ছিস না? এবার দেখবি মজা? পেঁপে বলে ক্লাসের মধ্যে চেঁচাব নাকি?"

এরপরেও কী অপলক ঘুষি ছুঁড়বে না?

ফুটবল ম্যাচে সেমসাইডের ঘটনার পিছনেও সেই ডাকনাম। প্রান্তিকের ডাকনাম। এমন মনকাড়া নামের একটা ছেলের ডাকনাম যে কেন 'গোল' হয়েছিল কে বলতে পারে? প্রান্তিক মোটেও গোলগাল দেখতে নয়। ড্রইং ক্লাসে যে ভাল সার্কেল আঁকে তাও নয়। তবে? তবে আর কী। ডাকনাম যে কোনটা হবে কে বলতে পারে। বেচারি প্রান্তিকের কপালেও তাই ঘটেছে। আর সেটাই গোলমাল পাকালো ম্যাচের সময়।

মুহূর্তটা ছিল চরম টেনশনের। হঠাৎ একটা ঝটকা দিয়ে ক্লাস এইটের সৌর্য বল নিয়ে ক্লাস সেভেনের গোল পোস্টে পৌঁছে যায়। গোল কী হবে? গোটা মাঠ তাকিয়ে আছে। প্রান্তিক ছুটে আসে। লাফিয়ে বল কেড়ে নেয় সৌর্যর পা থেকে। ছোট দুটো ট্যাকেলে টপকে যায় এইটের অধিরাজ আর স্পন্দনকে। হাততালি আর চিৎকারে ফেটে পড়ে মাঠের পাশে দাঁড়ানো ছেলেরা। প্রান্তিক এগিয়ে আসে নিজেদের গোলপোস্টের দিকে। গোলপোস্টে দাঁড়ানো ঋষভ হাত পেতে চিৎকার করে ওঠে—

"গোল দে। গোল দে। তাড়াতাড়ি দে। দেরি করিস না। গোল, গোল...:"

আর এখানেই হয় ভুল। যে ভুল হওয়ার নয়। যে ভুল কখনও

হয় না। চরম উত্তেজনায় সেই ভুলটাই করে বসে প্রান্তিক। 'গোল' যে তার ডাকনাম এটাই ভুলে গেল সেই মুহূর্তের জন্য! পাড়ার বন্ধু ঋষভ তাকে সেই নামে ডেকে নিজের হাতে বল চাইছে সেইটাই মাথা থেকে উবে যায় যেন! অবধারিত গোল বাঁচানোর আনন্দে সব গোলমাল হয়ে যায়। প্রান্তিক শরীরের সব শক্তি দিয়ে বলে শট মারে। ওস্তাদ গোলকিপার ঋষভকে খুব সহজেই পরাস্ত করে নিজেদের গোলে বল ঢুকে যায় হাসতে হাসতে। বন্ধুর 'গোল দে' শুনে সে 'গোল দিয়ে' বসে!

তারপর? তারপর আর কী? দুজনেই নলিশ জানাতে ছোটে গেম টিচারের কাছে।

পেঁপে, গোল তাও মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু 'চুপ'? 'চুপ' কখনও কারও ডাকনাম হতে পারে? হলে যা ঘটতে পারে সেটাই ঘটল ক্লাস টেনের সিঞ্চনের। আর সেটাই তিন নম্বর মারাত্মক ঘটনা।

সিঞ্চন তার 'সিঞ্চন' নাম নিয়ে খুবই গর্বিত। কেনই বা হবে না? সত্যি তো এমন সুন্দর নাম হয় কজনের? সে 'চুপ' এর কথা ঘুণাক্ষরেও বলে না কাউকে। অপলকের মতোই ডাকনাম লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেদিন হল দুর্ঘটনা। সেই দুর্ঘটনা নিজেই ঘটাল সিঞ্চন। এটাও অনেকটা ফুটবল ম্যাচের সেমসাইডের মতো।

সোমবার অঙ্কের স্যার ভূপতিবাবু বোর্ডে অঙ্ক কসছিলেন। ক্লাসে চলছিল চাপা গুঞ্জন। স্যার পিছনে ফিরে ধমক দিলেন—

'চুপ!'

সিঞ্চন ছিল অন্যমনস্ক। নিজের 'নাম' শুনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল "কী স্যার?"

"কী স্যার মানে?" ভূপতি স্যারের ভুরু গেল কুঁচকে। বললেন, "তুমি উঠে দাঁড়িয়েছো কেন সিঞ্চন?"

"ওই যে আমায় ডাকলেন।"

"ডাকলাম মনে। ফাজলামি হচ্ছে ছেলে? চুপ তোমার নাম নাকি?"

নাভার্স সিঞ্চন নিজেকে সামলাতে পারল না। বলে ফেলল, "হ্যাঁ, স্যার। চুপ আমার ডাকনাম। তবে বাড়ির নয়, শুধু মামাবাড়ির।"

ব্যস। হাত থেকে তীর বেরিয়ে গেল। পরের কটা দিন ছেলেরা সিঞ্চনকে 'চুপ' নামে ডেকে ডেকে কান একেবারে ঝালাপালা করে দিল। তিনদিনের মাথায় অতিষ্ঠ সিঞ্চন 'পেট ব্যথা' বলে পালালো। ফিরল একেবারে বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে নালিশ জানাতে।

এরপরই বোর্ডে হেডস্যারের নোটিশ। তাতে তিনি যা লিখেছেন তার মোদ্দা কথা হল—আমাদের স্কুলে ছেলেদের নাম অতি চমৎকার। সেই নাম উচ্চারণে আনন্দ, শুনতে আরাম, বলতে গর্ব। সুতরাং সেইসব নাম বাদ দিয়ে বিচ্ছিরি ডাকনামে ডাকাডাকি আর চলবে না। এতে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। তাই এখন থেকে স্কুলের ভেতর ডাকনাম নিষিদ্ধ। যদি কেউ এই নিষেধ না মানে... (শেষ লাইন পড়া যাচ্ছে না। কাঁচের দাগে ঢাকা পড়েছে)।

কথাটা ভুল নয়। আমাদের স্কুলের ছেলেদের নাম সত্যি ভাল। অপলক, ঋষভ, সিঞ্চন, তুর্য, প্রান্তিক, সৌর্য, স্পন্দন। কী নেই? এসব বাদ দিয়ে পেঁপে, গোল, চুপ! ছিঃ। স্কুলের সব ছাত্রই হেডস্যারের নোটিশের সঙ্গে একমত। নিষেধাজ্ঞা জারি করে উনি ঠিক কাজই করেছেন।

কিন্তু নোটিশ লাগানোর দুদিন পর থেকেই উল্টো কাণ্ড শুরু হয়ে গেল!

নিষেধের একটা মজা আছে। যেটা নিষেধ করা হয় সেটাই যেন বেশি বেশি করে টানে। বিশেষ করে অল্প বয়সে তো বটেই। আমাদের স্কুলের ছেলেদেরও সেটাই হয়েছে। তারা মহা উৎসাহে ডাকনাম সংগ্রহে নেমে পড়েছে! সংগ্রহের কাজ চলছে খুব গোপনে। ক্লাসে ক্লাসে ডাকটিকিটের খাতার মতো ডাকনামের খাতা তৈরি হয়েছে। আশ্চর্যের কথা হল, অনেকে নিজে এসে সেই খাতায় নিজের ডাকনাম জমা করে যাচ্ছে! সেই সব খাতা অদল বদলও চলে। ক্লাস সিক্সের খাতা আসে সেভেনে। সেভেনের খাতা চলে যায় নাইনে। এতদিন যা লুকোনোর জন্য সবাই চেষ্টা করত, নিষেধের পর এখন সেটাই সবাইকে জানাতে চাইছে!

বাপ্‌রে, ডাকনাম যে এতরকম হতে পারে কে জানত? আপেল, টুথপেস্ট, পাটিগণিত তো আছেই এমনকি মাউস, ফ্লপি, সিডি, রিংটোন

পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে! ক্লাস সিক্সের সবথেকে হাসিখুশি শাকম্ভরের ডাকনাম যে 'কাঁদুনে' সেটা যদি সে নিজে এসে না বলত, কে বিশ্বাস করত? কে জানে হয়তো এই কারণেই ডাকনাম এত মজার। নোটিশের পর আরও কাণ্ড হয়েছে। ডাকনাম নিয়ে কেউ আর রাগারাগি করছে না! বরং বিচ্ছিরি নামটা হেডস্যারের নিষেধে সত্যি সত্যি মুছে না গিয়ে খাতায় লেখা হয়ে থাকছে তাতে তারা বেজায় খুশি।

কেন এরকম হল কে জানে? ডাকনামের পিছন কি ভালবাসা বেশি থাকে?

হেডস্যার জানলে শাস্তি যে মারাত্মক কোন সন্দেহ নেই। তবে শোনা যাচ্ছে, স্যারেরাও নাকি ডাকনাম সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন! তবে সেটা খাতা নয়, ছোট্ট নোটবুক। টিচার রুমে সেই নোটবুক লুকোনো আছে। খবর ঠিক কিনা বলতে পারব না। স্যারেদের একথা জিগ্যেস করার সাহস কারও নেই।

প্রেয়ার

আমাদের ক্লাস, অর্থাৎ ক্লাস সেভেনের ঘরটাই স্কুলের সব থেকে বড় ঘর। পবনপুর শ্রীমতী কালিদাসী স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয়ে এত বড় ক্লাসঘর আর একটাও নেই। আমাদের স্কুল শুরু হয় বেলা এগারোটায়। শুরু হয় বলা ঠিক হবে না, বরং বলা ভাল প্রথম ঘণ্টা পড়ে। আমরা তখন যে যেখানে থাকি হুড়োহুড়ি করে ক্লাসঘরে চলে যাই। অন্যসব ক্লাসের ছেলেরাও তখন আমাদের ঘরে চলে আসে। ঘরের চারপাশে সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়ে। এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে দু নম্বর ঘণ্টাটা বাজে। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রেয়ার শুরু হয়ে যায়।

আমাদের প্রেয়ার হল 'বন্দেমাতরম্ সুজলাং সুফলাং...'। বেশি নয়। প্রথম প্যারাগ্রাফটুকু। এরকমই চলছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন কী জানি কী হল, আমাদের ইতিহাসের স্যার কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলি ঘোষণা করলেন, না আর নয়। রোজ রোজ একই গান কেন? এবার থেকে ছেলেরা প্রেয়ারের সময় একেকদিন একেকটা গান গাইবে। কিন্তু মুশকিল হল, ছেলেরা তো গান জানে না। কুঞ্জবিহারী স্যার বললেন, 'কই বাৎ নেহি। ডরো মৎ। আমি গান শেখাব। দু-একদিন রপ্ত করলেই

সব ঠিক হয়ে যাবে। আসছে সোমবার থেকে শুরু হবে।' আমাদের তো খুব উৎসাহ। বেশ নতুন একটা কিছু হবে।

সোমবার আমরা সব তাড়াতাড়ি স্কুলে চলে এলাম। অনেকেই অবশ্য ভাল করে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কী। ফাংশন টাংশন কিছু একটা হতে চলেছে ভেবে কেউ কেউ ইস্তিরি করা জামা-প্যান্ট পরে এল। হয়ত অনেকক্ষণ থাকতে হবে ভেবে কারও বাড়ি থেকে বেশি করে টিফিন দিয়ে দিল। সব থেকে ভয়ঙ্কর ঘটনা হল, ক্লাস নাইনের নেপু বগলদাবা করে বাঁয়া তবলা নিয়ে এসে হাজির হল হাসি হাসি মুখে। কুঞ্জবিহারী স্যার যথাসময়ে আমাদের ঘরে এলেন। পেছনে পেছনে অখিল বেয়ারা বয়ে নিয়ে এল একটা হারমোনিয়াম। টেবিলে হারমোনিয়াম, তবলা। একদিকে আমরা অন্যদিকে কুঞ্জবিহারী স্যার আর নেপু। ঘরে টুঁ শব্দ নেই। থম থম করছে। কী হয়, কী হয় ভাব। স্যার বললেন, 'শোন আমি প্রথমে এক লাইন গাইব। শুনে শুনে তোমরা গাইবে।' একথা বলে তিনি হারমোনিয়াম টেনে টুনে দেখে নিলেন। নেপুর কানে কানে কী বললেন। নেপু খুব ঘাড় নাড়ল। এমন সময় দু-নম্বর ঘণ্টা বাজল।

স্যার শুরু করলেন, 'আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার—।'

বেজে উঠল হারমোনিয়াম। শুরু হল তবলার বোল। আমরা হতবাক। কোথায় গান? কোথায় হারমোনিয়াম? কোথায় তবলা? তিনটে যেন তিনদিকে ছুটছে! মনে হচ্ছে যেন একশো লোক মিলে ছাদ পেটাচ্ছে। ওরকম রোগা রোগা ইতিহাস স্যারের গলা যে এমন আশ্চর্য রকম হাঁড়ির মত হতে পারে কে ভেবেছিল? চোখ বুজে, আবেগ নিয়ে তিনি গেয়ে চলেছেন, 'এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর—।' তারপর হঠাৎ চোখ খুলে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কিরে তোরা গা।'

নেপুও টেরি নাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ গা গা।'

অগত্যা আর উপায় কী? আমরা প্রায় শ-দুয়েক ছেলে মিলে উচ্চৈস্বরে শুরু করলাম। দুশো জন মিলে ভুল সুরে, গলা ফাটিয়ে যদি 'আমাদের যাত্রা হল শুরু—' গাইতে থাকে তাহলে যে কী ঘটতে পারে

তা এক মিনিটের মধ্যে বোঝা গেল। গাইতে গাইতে শুনতে পেলাম হারমোনিয়াম আর তবলাকে ছাপিয়ে একটা গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে। গান থামিয়ে সকলে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের ক্লাসের মুকুন্দরাম ঘটকের মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বের হচ্ছে। আর সে মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে। ওই দৃশ্য দেখে ক্লাস ফাইভের একটা ছেলে 'ওরে বাবা রে, আমি আর গাইব না রে' বলে কাঁদতে শুরু করল। হেডস্যার ছুটে এলেন।

তারপর? তারপর আর কী। আমরা আবার প্রেয়ারের সময় 'বন্দেমাতরম' গাই। তবে মুকুন্দ নাকি এখনও রাতে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে গোঁ-গোঁ শব্দ করে!
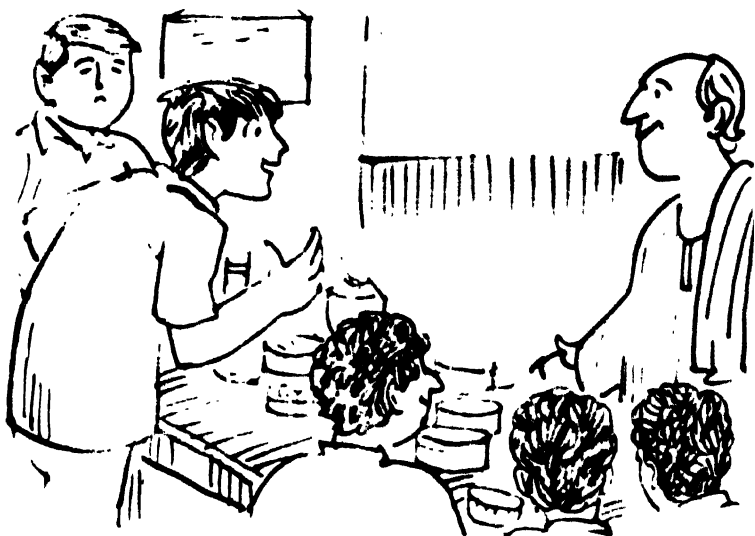
টিফিন কমপিটিশন

আমাদের এই পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের নানারকম মজার কম্পিটিশন হয়। আমাদের বাংলার মাস্টারমশাই বিমানবাবু এসব ব্যবস্থা করেন। ওঁর মাথা থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব আইডিয়া বের হয়। এসব কম্পিটিশনে আমাদের খুব উৎসাহ। পড়াশুনোর সঙ্গে বেশ একটা অন্যরকম দিন কাটাই। এরকম একটা কম্পিটিশনের গল্প বলি।

বিমান স্যার একদিন বললেন, 'আগামীকাল তোমাদের একটা কম্পিটিশন হবে।' আমরা তো হৈ হৈ করে উঠলাম, 'কিসের কম্পিটিশন?'

স্যার বললেন, টিফিন কম্পিটিশন। টিফিনের সময় আমি ঘুরে ঘুরে দেখব কে কে টিফিন খাও। যার টিফিন আমার সব থেকে ভাল লাগবে সে ফার্স্ট হবে। মনে রাখবে বিচার কিন্তু সবদিক থেকে হবে। যে টিফিন আনবে সেটা খেতে ভাল কিনা, কুড়ি মিনিট টিফিন টাইমের মধ্যে সেই টিফিন তোমরা শেষ করতে পারছ কি না, টিফিন খেয়ে স্কুল নোংরা কর কিনা—এইরকম সবদিক দেখব কিন্তু। ক্লাস সেভেনের সবাই তো দারুণ খুশি। এমন প্রতিযোগিতার কথা আগে কেউ কখনও

শোনেনি।

পরদিন আমাদের ক্লাসে সে একটা দেখবার মত দৃশ্য! পিন্টু এসেছে ইয়া বড় চারটে বাটিওলা একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে, সোমনাথ এল কাঁধে একটা ফ্লাস্ক ঝুলিয়ে, সুমনের হাতে একটা ঠোঙা, মানসের সঙ্গে ওয়াটার বটল, দেবুর সঙ্গে ওদের বাড়ির কাজের ছেলে নিমাই এল। নিমাইয়ের হাতে একটা ডাব। প্রণব নিয়ে এসেছে মিষ্টির বাক্স আর হাঁড়ি, কৃষ্ণেন্দুর জামার পকেট থেকে কাঁটাচামচ উঁকি মারছে। আরও সবাই কত কি যে নিয়ে এসেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। তবে কেউ কিন্তু বলছে না যে কী টিফিন এনেছে। সবার মুখেই মিটিমিটি হাসি। 'আজ দেখে নেব', এমন একটা ভাব সকলেরই।

টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই শুরু হল সে এক দারুণ কাণ্ড! পিন্টু টিফিন ক্যারিয়ার খুলে সাজিয়ে বসল। নুন, লেবু, ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, চাটনি। সোমনাথ ফ্লাস্ক থেকে গরম দুধ ঢালতে লাগল। সুমনের ঠোঙা থেকে বের হল ফুলুরি, বেগুনি, মোচার চপ। মানসের ওয়াটার বটলে লেবুর সরবত। দেবু পেনসিল কাটার ছুরি দিয়ে ডাবের মুখ কাটতে শুরু করল। প্রণব সন্দেশ আর রাজভোগ এনেছে। কৃষ্ণেন্দু গলায় রুমাল বেঁধে কাঁটা চামচ দিয়ে চাউমিন খেতে শুরু করল। এছাড়া কেউ এনেছে, প্যাকেট ভর্তি বিস্কুট। এমনকি ক্যাডবেরি পর্যন্ত।

এদিকে স্কুলে তো কম্পিটিশনের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য ক্লাসের ছাত্ররা সব দরজা-জানলায় ভিড় করেছে। খুব হাসাহাসি করছে সবাই। আমাদের ক্লাস সেভেনের ঘরটা যেন নেমন্তন্ন বাড়ি! বিমান স্যার ঢুকলেন। তাঁর মুখেও হাসি। তিনি এক একটা বেঞ্চে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন আর কাগজের টুকরোতে কিসব লিখতে লাগলেন। এদিকে আমরা তো খুব জোর খাওয়া-দাওয়া সারছি। এমন সময় বিমান স্যার ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন আমাদের নিমাই সামন্তর সামনে। সে টিফিন খাচ্ছে না, কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে তোর টিফিন খাওয়া হয়ে গেছে? নিমাই প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। সে বলল, 'স্যার টিফিন কিনব বলে বাবার কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সত্যি বলছি স্যার। একটা ভাল কেক কিনেছিলাম স্যার। বিশ্বাস করুন স্যার। কিন্তু স্কুলে ঢোকবার

সময় বাহাদুরের (স্কুলের দারোয়ান) ছোট ছেলেটা এমন জ্বল জ্বল করে তাকাচ্ছিল—কেকটা স্যার ওকে দিয়ে দিলাম। আপনি স্যার বাহাদুরকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন—।'

স্যার খুব বিরক্ত মুখে নিমাইকে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। দুঃখ কর না। পরেরবার আবার যোগ দিও কম্পিটিশনে।' তিনি আবার ঘুরতে লাগলেন। প্রণব একবার স্যারকে বলল, 'একটা রাজভোগ খাবেন স্যার?' স্যার কঠিন চোখে প্রণবের দিকে তাকালেন। ঘণ্টা পড়তে কম্পিটিশন শেষ হল। পরের দিন ফলাফল জানানো হবে।

এরপর সারাটা দিন ধরে আমাদের খুব আলোচনা চলল। তপন বলল, 'মনে হচ্ছে পিন্টুই ফার্স্ট হবে।' অজয়ের মতে ফার্স্ট হওয়া উচিত বাবলুর। কেননা ও হজমি আর আচার এনেছিল। অলক কিন্তু বলল, 'ফার্স্ট প্রণবই হচ্ছে। ও কেমন স্যারকে রাজভোগ খাওয়াতে গেল।' তবে একটা বিষয়ে আমরা সবাই একমত হলাম যে নিমাইটা খুব বোকামি করেছে। বিমানস্যার ওর ওপর খুবই বিরক্ত হয়েছেন।

পরদিন স্কুলে গিয়েই আমরা নোটিস বোর্ডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। যা দেখলাম তাতে কৃষ্ণেন্দুর মুখ চামচের মত, প্রণবের মুখ রাজভোগের মত, দেবুর মুখ ডাবের মত হয়ে গেল।

বিমান স্যার নোটিস ঝুলিয়েছেন ঃ ক্লাস সেভেনের টিফিন কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে নিমাই সামন্ত।

মামা বাড়ির খাওয়া

আমাদের ক্লাসের মনোজের মামার একটা অদ্ভুত নেশা আছে। এমন নেশার কথা কেউ কখনও শোনেনি। নেশাটা হল, লোককে বেজায় খাওয়ানো। দিনে অন্তত একজনকে মনের মত খাওয়াতে না পারলে ওঁর রাতে ঘুম হয় না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন। সারারাত ছাদে পায়চারি করতে হয়। ভোররাতে মাথায় জল ঢালতে হয়। সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে।

আর খাওয়ানো মানে, যেরকম সেরকম ভাবে নম নম করে খাওয়ানো নয় মোটেই। রীতিমত খাওয়ানো। গলা পর্যন্ত খাওয়ানো, জোর করে খাওয়ানো, দম বন্ধ করে খাওয়ানো। মোট কথা হল, খাওয়াতে খাওয়াতে যতক্ষণ না মামার তৃপ্তি হচ্ছে, যতক্ষণ না মনে হচ্ছে যে যাকে তিনি খাওয়াচ্ছেন, তার খাওয়ার মত খাওয়া হচ্ছে ততক্ষণ তিনি থামতে চান না মোটেও।

খাওয়াতে অনেকেই ভালবাসে। আমার কাঁকুড়গাছির মাসি, প্রণবের উল্টোডাঙার কাকা, দেবুর বারুইপুরের পিসিও কি কম কিছু খাওয়াতে ভালবাসে? মোটেই না। আমাদের একবার হাতে পেলেই

হল। পেট পুরে খাইয়ে তবে ছাড়বে। এদের কাছে খাওয়ার পর মনটা কেমন ফুরফুর করে। মনে হয়, আহা দিনটা কত ভাল। কিন্তু মনোজের মামার খাওয়ানো তো একপেশে খাওয়ানো! আর সে কথাটা বেশ ভালভাবেই জানাজানি হয়ে গেছে। খেতে কে না ভালবাসে? ভালমন্দ খাবার দাবার পেলে কার না ভাল লাগে? আর যদি কেউ নিজে থেকে ডেকে, আদর যত্ন করে খাওয়ায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু মনোজের মামার এই ঠেসেঠুসে, পারলে গলায় বাঁশ ঢুকিয়ে, চেপেচুপে খাওয়ানোকে সবাই ভয় পায়।

আর ভয় পাবেই না বা কেন? একবার মনোজকেই তো উনি পঁয়তাল্লিশটা রসগোল্লা খাইয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন আর কী! সেবার মনোজের কোন দূর সম্পর্কের দাদাকে এক হাঁড়ি রাবড়ি খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। মামার নজরে একবার পড়ে গেলেই হল। না খেয়ে পালাবার কোনও পথ নেই। ষণ্ডামার্কা ছ'টা দারোয়ান মামার হুকুম ছাড়া দরজা খুলবে না মোটেও। সুতরাং নিজের ইচ্ছেমত খেয়ে নিয়ে যে কেউ চম্পট দেবে সে গুড়ে বালি।

প্রথম প্রথম যখন মামার এই ভয়ঙ্কর নেশার কথা তেমন করে ছড়ায়নি, তখন অনেকেই ভাল ভাল খাওয়ার লোভে ওখানে যেত। এখন আর তা হয় না। বেশিরভাগ লোকই জানে, মনোজের মামার বাড়ির খাওয়া মানে ফাঁসির খাওয়া। খেতে বসে যতই কেউ বলুক, ঠিক আছে মামা, আর নয়। পেট একেবারে আইঢাই হয়ে গেছে। ততই মামা বলবেন, দূর! এ আবার খাওয়া নাকি? মামার বাড়ির খাওয়া কী একে বলে? এ তো সবে শুরু।

আজকাল তাই মামার খাওয়ার লোক পেতে ভারি মুশকিল হচ্ছে। বড় বড় খাইয়েরাও ওঁর বাড়ির ধারেকাছে যাচ্ছে না।

একদিন মনোজ স্কুলে এল কাঁচুমাচু মুখে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল?"

মনোজ বলল, "মামী গতকাল আমাদের বাড়িতে এসে খুব কান্নাকাটি করছেন। মামার এই নেশা যেমন করে হোক কাটাতে হবে। মামার সর্বনেশে খাওয়ানোর দুর্নাম এত হয়েছে যে ফেরিওয়ালারা

পর্যন্ত মামার বাড়ি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আর মামার জমানো টাকাও সব ফতুর হয়ে যেতে বসেছে। তোরা কোনও একটা উপায় কর ভাই। নাহলে আর রক্ষে নেই।" এই কথা বলে মনোজ আমাদের হাত জড়িয়ে ধরল।

আমরা ভাবতে বসলাম। টিফিন টাইমে খুব আলোচনা হল। এক একজন এক-একটা প্ল্যান দিতে থাকল। একজন বলল, মামী যদি সিন্দুকের চাবি লুকিয়ে রাখেন? একজন বলল, আমরা যদি মিষ্টির দোকানগুলোকে বলে দিই মামাকে মিষ্টি বিক্রি না করতে। একজন বলল, মামাকে যদি একদিন জোর করে একশোটা রাজভোগ খাইয়ে দিই। এমন সময় আমাদের মধ্যে সবথেকে চালাক মানস বলল, "না, এভাবে হবে না। মামার নেশা কাটাতে হবে অন্যভাবে। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তবে তার জন্য মামীমাকে কয়েকদিন মনোজের বাড়ি এসে থাকতে হবে।"

মনোজ বলল, "সে আর এমন কী? কাল থেকেই হবে।"

মানস তখন মনোজকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোর মামা রাতের খাবার কখন খেয়ে নেন?"

মনোজ বলল, "লোককে ওরকম খাওয়ালে কী হবে, মামা নিজে তো সামান্য খান। উনি ঠিক রাত দশটায় খেতে বসেন।"

মানস বলল, "ঠিক আছে। এখানে রাত দশটার আগেই দোকান বাজার সব বন্ধ হয়ে যায়।" সুতরাং মামা যে তখন দোকান থেকে খাবার কিনবে তারও উপায় নেই। তাই তো? কিছুই বুঝতে পারলাম না। মানস বলল, "দেখ না মজা। মামার খাওয়ানোর নেশা কেমন দৌড়ে পালায়। আমি যা বলব, তাই তোদের করতে হবে।"

পরদিন ঠিক রাত দশটার সময় আমরা পাঁচজন ছেলে মনোজের মামার বাড়ি হাজির হলাম। দরজা খুলে মামা আমাদের দেখে তো অবাক। মানস বলল, "মামা, অনেকদিন আপনার বাড়িতে আসা হয়নি। তাই এলাম। বড় খিদেও পেয়েছিল। যদি—।"

খাওয়ার কথা শুনে প্রথমে মামার মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

পরের মুহূর্তেই কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "কিন্তু এত রাতে তোদের কী খাওয়াব? ইস্, তোরা যদি একটু খবর দিয়ে আসতিস। আমার যে

হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে।"

আমরা বললাম, "কোনও চিন্তা নেই মামা। আপনার বাড়িতে এখন যা আছে, তাই খাব। মামা বললেন, "এখন রুটি, এক বাটি আলু-কুমড়োর তরকারি আছে।"

আমরা সমস্বরে বললাম, "ওতেই হবে।"

এরপর আমরা পাঁচজন একটুও দেরি না করে রান্নাঘরে ঢুকে মামার রাতের খাবরটা নিমেষে সাবাড় করে দিলাম। বিস্কুটের কৌটো, চানাচুরের শিশি ফাঁকা করে ফেললাম। তারপর ভালমানুষের মত বাড়ি চলে এলাম। মামা ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পরদিন আবার একই ঘটনা। মামা তো তখন রাতের খাবার খেতে শুরু করে ফেলেছিলেন আর কী! তারপরের দিনও এক কাজ। তারপরের দিনও, তারপরের দিনও। এরকম টানা সাতদিন আমরা বলতে গেলে লুটেপুটে মামার রাতের খাবার খেয়ে এলাম।

আটদিনের দিনও যখন পাঁচজনে মিলে মামার বাড়ির সামনে হাজির হলাম, আমরা দেখলাম দরজায় ইয়া বড় একটা তালা ঝুলছে।

জুলজুল করে বসে থাকা দারোয়ান দুটো বলল, "বাবু মনোজদার বাড়ি চলে গেছেন।"

আমরা লাফিয়ে উঠলাম, "হুররে!"

সাতরাত উপবাসে কাটিয়ে মামার নেশা ছুটে গেল। খেতে না পাওয়ার কষ্ট থেকে তিনি বুঝলেন, বেশি খাওয়ালে কষ্ট কত হয়।

ইউনিফর্ম

আমাদের স্কুলের ইউনিফর্ম নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে, অনেক গোলমাল হয়েছে। প্রথমে আমরা যে ইউনিফর্ম পরতাম, এখন আর সেটা পরি না। বদলে দেওয়া হয়েছে। এখন যেটা পরছি সেটাও আর কতদিন চলবে, কে জানে? সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এই পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম একটা সমস্যার ব্যাপার।

স্কুল চালু হওয়ার মুখে মুখে শুরু হল ইউনিফর্ম নিয়ে মিটিং। সেইসব মিটিংয়ে পবনপুরের মান্যিগণ্যি ব্যক্তিরাও উপস্থিত থাকতেন। তবে হল কী, আমাদের পবনপুরের বড়রা তো কোন ব্যাপারেই কিছুতে একমত হন না। একজন একরকম বলেন তো আর একজন উল্টো বলবেন। ইউনিফর্ম নিয়ে মিটিংগুলোতেও সেরকম হচ্ছিল। কিছুতেই কোন ফয়সালা হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত স্কুল কমিটির সদস্যরা ঠিক করলেন, এবার মিটিংয়ে নিয়ে আসা হবে শিবপদ ভট্টাচার্যকে। অর্থাৎ আমাদের পবনপুরের এম এল এ-কে। তিনি একদিকে যেমন এম এল এ, অন্যদিকে তখন আবার তিনি না বললে এই স্কুলই হত না। সুতরাং তাঁর কথার যথেষ্ট দাম আছে। তিনি যা বলবেন তাই হবে শেষ কথা।

সামান্য ইউনিফর্ম নিয়ে ডাকা মিটিংয়ে সভাপতি হতে হবে শুনে প্রথমে শিবপদবাবু রাজি হননি। পরে কী যেন হল, তিনি খবর পাঠালেন, "আমি যাচ্ছি।"

এম এল এ মশাই মিটিংয়ে বেশি কিছু বলেননি। সামান্য দু'চার

কথা। তিনি বললেন, "প্রথমে ভেবেছিলাম, এই সভায় আসব না। পরে ভুল ভাঙল। বিষয় যখন ইউনিফর্ম তখন তো আমাকে আসতেই হবে। ইউনিফর্ম মানে হল গিয়ে ইউনিটি, মানে হল গিয়ে সংহতি, সবাই মিলে মিশে থাকার শপথ। এটাই এখন সব থেকে বড় কথা। আসল কথা। মহান কথা। আর তাছাড়া পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে ইউনিফর্ম পরবে তা বাইরে থেকে কেন আসবে? ছি ছি। সে হবে আমাদের লজ্জার। তাই অনেক ভেবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই স্কুলের ছাত্ররা যে ইউনিফর্ম পরবে তা তৈরি হবে মাধব সাঁতরার দোকান থেকেই। আপনারা মাধবকেই দায়িত্ব দিন।" অনেক হাততালি, আর জলভরা সন্দেশ দিয়ে সেই মিটিং শেষ হয়েছিল।

মাধব সাঁতরা এম এল এ মশাইয়ের দূর সম্পর্কের ভাগনে। পবনপুরের রেল স্টেশনের পাশে তাঁর জামা-কাপড়ের দোকান 'লজ্জা নিবারণ'। এক সপ্তাহের মধ্যেই স্কুলের তিনশো ছাত্রের ইউনিফর্মের অর্ডার সেখানে জমা হল। মাধববাবুই ঠিক করলেন, জামার রং হবে নীল, প্যান্ট হবে সাদা। হলও তাই।

তবে এখানেই ইউনিফর্ম নিয়ে গণ্ডগোল থেমে গেল না।

গত বর্ষাতে ছেলেদের সেই নীল জামা থেকে রং উঠতে শুরু করল। নীল রং গড়িয়ে গড়িয়ে সাদা প্যান্টের ওপর পড়তে লাগল। প্রথমে একজন দুজনের তারপর দশজন বিশজনের, শেষপর্যন্ত একশজন দেড়শজনের! দল বেঁধে ছাত্ররা যখন স্কুলে আসত বা যেত তখন সে এক কিম্ভূতকিমাকার দৃশ্য। অভিভাবকরা প্রথমে মাধব সাঁতরার কাছে গিয়ে বলল, তারপর স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছে গিয়ে বলল, কিন্তু উপায় নেই। মাধব সাঁতরার 'লজ্জা নিবারণ' দোকান থেকেই ইউনিফর্ম তৈরি করতে হবে। এম এল এ মশাই যে সেরকমই বলে দিয়েছেন। তাই হেডমাস্টার মশাই মাধববাবুকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "এ তো আর চোখে দেখা যায় না। একটা কিছু করুন।"

তারপরই মাধববাবু ইউনিফর্মের রং বদলে দিয়েছেন। নীল জামার বদলে সাদা জামা। আর সাদা প্যান্টের বদলে নীল প্যান্ট। মাধববাবু বলেন, 'আবার যে রং উঠবে না এমন কথা বলতে পারি না। তবে সাদা জামা থেকে রং উঠলেও সাদা জামা সাদাই থাকবে।'
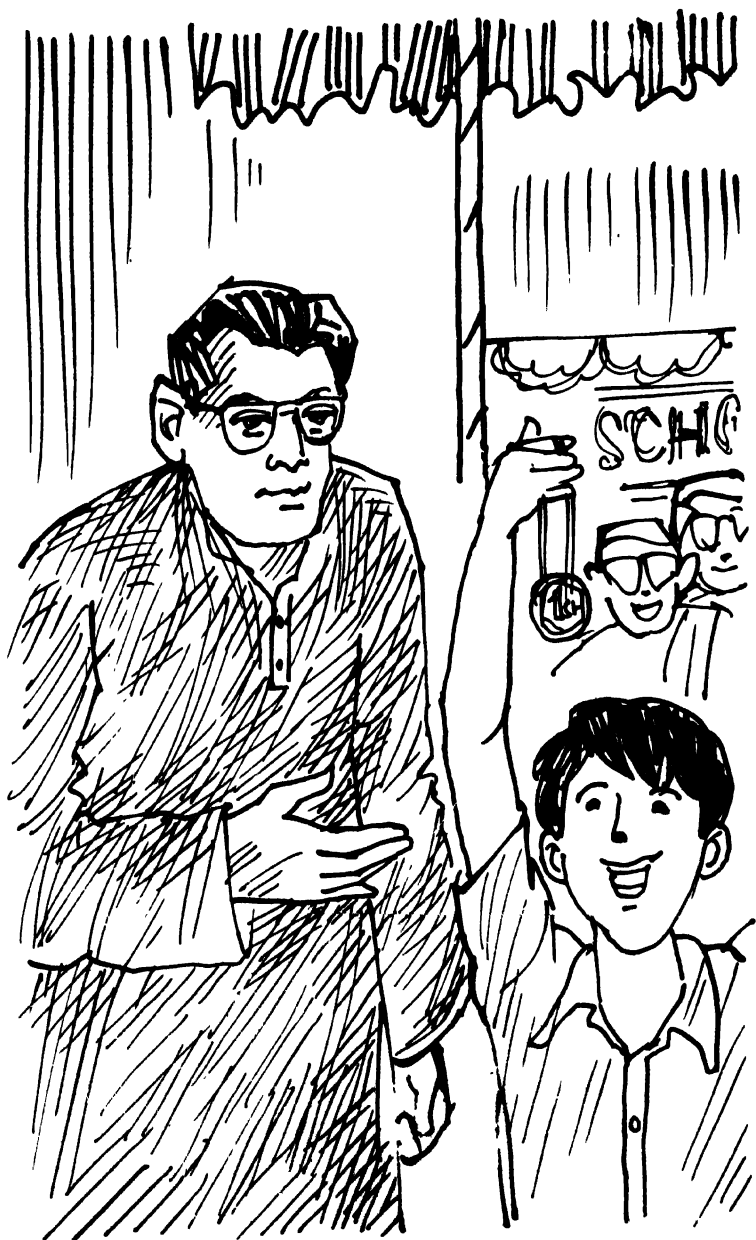
ক্লাস নাইনের ভূত

আমাদের স্পোর্টসে এক একজন ছেলে এক একটা ইভেন্টে দুর্দান্ত। তাদের পারফরমেন্স নিয়ে আমরা সারা বছর আলোচনা, ঝগড়া এমনকি মারামারি পর্যন্ত করি।

কয়েকটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

ক্লাস নাইনে ছিপছিপে বাসুদেব একশো মিটার দৌড়ে একেবারে মারাত্মক। চোখের পলক পড়বার আগেই দৌড় শেষ। কালো হাফ প্যান্ট আর সাদা গেঞ্জি না পরে, ও যদি দৌড়নোর সময় কালো হলুদ ডোরাকাটা কোনও পোশাক পরত তা হলে ঠিক মনে হত বাসুদেব নয়, একটা চিতাবাঘ ছুটছে। বাসুদেবের দৌড়ের কায়দা আমরা অনেকেই নকল করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কখনই ঠিকমতো হয় না। ওর স্টার্ট আর ফিনিশিং নিয়ে একবার ক্লাস সেভেনের সঞ্জয় আর ক্লাস এইটের অমৃতর মধ্যে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছিল।

বাসুদেবের দৌড় যদি চিতাবাঘের মতো হয়, তা হলে রাজার হাই জাম্প পাখির মতো। ক্লাস সিক্সের রাজাকে শুধু তার ক্লাসের ছেলেরা হিংসে করে বললে ভুল হবে। গোটা স্কুলের ছাত্ররাই হিংসে করে। হিংসে করে আবার ওকে নিয়ে গর্বও করে। আশেপাশে চার-পাঁচটা স্কুলে খবর নিয়ে দেখা গেছে, এমন হাই জাম্প দিতে কেউ পারে না। লাফাচ্ছে তো না, যেন ডানা মেলে উড়ছে!

অঙ্ক স্যার সুশীলবাবু হোমটাস্ক না করলে পরদিন ডবল হোমটাস্ক দেন। সেই সুশীলবাবু পর্যন্ত রাজাকে বলেন, "তোকে শুধু ছাড়। তুই বাড়িতে অঙ্ক প্র্যাকটিস না করে হাই জাম্প প্র্যাকটিস করবি। এতদিন জানতাম লাফিয়ে লাফিয়ে জীবনে উন্নতির ব্যাপারটা শুধুমাত্র কথার কথা। তোকে দেখে বুঝতে পারছি, না, কথার কথা নয়। তুই সত্যি লাফিয়ে উন্নতি করবি। তুই বাবা মন দিয়ে লাফা, আরও বেশি বেশি লাফা।"

রাজা মন দিয়েই লাফায়। নইলে প্রতি বছর স্পোর্টসে কেউ

নিজের রেকর্ড ভাঙতে পারে?

অনীশের হার্ডল রেস আমরা কখনও বসে দেখতে পারি না। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতেই হবে। গত বছর শেষ দুটো বেড়া সে যেভাবে পা তুলে টপকে গেল যে আমরা ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলেছিলাম। এই বুঝি বেড়া ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়বে। তবে ওর একটাই দুঃখ। স্পোর্টসের হার্ডল টপকালেও পরীক্ষার হার্ডল কিছুতেই টপকাতে পারে না। এই নিয়ে এইটে তার দু'বছর হয়ে গেল। ভূগোল আর ইতিহাসের বেড়ায় সে হোঁচট খেয়েছে। ইংরেজিতে তো একেবারে মুখ তোবড়ানো অবস্থা। তবে পরীক্ষায় ফেল করলেও হার্ডল রেসের জন্য স্কুলে অনীশের খুবই খাতির। সেও একটা 'অহঙ্কারী অহঙ্কারী' হাবভাব নিয়ে চলাফেরা করে। আমরা অবশ্য এই হাবভাবের জন্য কিছু মনে করি না। স্পোর্টসে যে এতগুলো কাপ আর মেডেল পেয়েছে, তার তো একটু অহঙ্কার হবেই। আমরা ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘুরঘুর করি।

গত দু'বছর ধরে শ্রীধরের নাম হয়েছে 'ক্যাঙারু'। প্রথম প্রথম শুধু ক্লাস সেভেনের ছেলেরাই ওকে এই নামে ডাকত। এখন স্কুলের সব ছেলেরাই 'ক্যাঙারু', 'ক্যাঙারু' করে। শুধু ছেলেরা নয়, মাস্টারমশাইদের কেউ কেউ ক্লাসে ঢুকে বলেন, "ক্যাঙারু, যাও তো লাফাতে লাফাতে টিচার্স রুমে গিয়ে চট করে চক আর ডাস্টারটা নিয়ে এসো তো। আনতে ভুলে গেছি।"

নিজের নাম বদলে দিলে সবাই রেগে যায়। শ্রীধর কিন্তু রাগে না। বরং তার বেশ আনন্দই হয়। সুকৃত সেদিন বলল, "আর কটা দিন যাক, দেখবি স্কুলের খাতাতেও শ্রীধরের নাম পাল্টে গেছে। লেখা হয়েছে ক্যাঙারু মজুমদার। হি হি।"

পরে স্কুলের খাতায় কী হবে সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না, তবে শ্রীধরের নাম এমনি এমনি 'ক্যাঙারু' হয়নি। সে স্পোর্টসের বস্তা দৌড়ে প্রতিবার এক নম্বর। মেডেল বাঁধা। দৌড় শুরুর বাঁশি একবার বাজলেই হল। দু'হাতে বস্তা তুলে তার লাফ তখন দেখার মতো। ক্যাঙারুর পেটে থলি থাকে। আর শ্রীধর হল থলির ভেতর ক্যাঙারু! আমাদের গেম টিচার অলকনন্দনবাবু ওকে দুঃখ করে বলেন, "ইস,

অলিম্পিকে স্যাক রেস ইভেন্টটা নেই রে শ্রীধর। থাকলে একদিন ঠিক তোর চান্স হত। তুই সোনা জিতে আসতিস। আমরা তোকে সংবর্ধনা দিতাম। বস্তা দিয়ে স্টেজ সাজানো হত।"

সে কী আর করা যাবে? শুধু বস্তা দৌড় কেন, জিলিপি দৌড় আর হাঁড়ি ভাঙাও তো অলিম্পিকেও নেই। কিন্তু ক্লাস ফাইভের জয় আর ক্লাস টেনের বিক্রম এই দুই খেলায় যে কত বড় ওস্তাদ সে কথা আর বাইরের কটা লোক জানতে পারল? জিলিপি দৌড় দিয়ে যে কেউ নাম করতে পারে, এমন কথা কেউ কখনও ভাবতে পেরেছে? জয় পেরেছে। শুধু পেরেছে নয়, একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে। পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সে যখন সবার আগে দৌড় শেষ করে তখন তার মুখে ঠিক আধখানা জিলিপির প্যাঁচ ধরা। সেই প্যাঁচ থেকে টপ টপ করে রস পড়ছে! বাকিদের অনেকে তখনও সুতো থেকে ঝোলানো সারি সারি জিলিপির সামনে নাচছে। মাঠের পাশে রাখা বক্সে চলছে বাজনা। মনে হচ্ছে, প্রতিযোগীরা যেন বাজনার তালে তালে নাচছে! সেই জিলিপি নাচ দেখে সকলে হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়ে!

সেবার অবশ্য কেলেঙ্কারি হল। জিলিপির ইভেন্ট দেখে আমরা হাসছি, হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কান্নার আওয়াজ। চমকে উঠলাম। স্পোর্টসের মাঠে কে কাঁদে? তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি, ক্লাস সিক্সের তমাল কাঁদছে। বেচারির হাত পিছনে বাঁধা বলে চোখের জল মুছতে পারছে না। মাঠের ধারে নিয়ে গিয়ে শান্ত করার পর চোখের জল মুছে সে জানাল, সেও এই দৌড়ে ছিল। সুতো থেকে জিলিপি ছিঁড়ে সবার আগে দৌড় শেষও করেছে। কিন্তু এসে দেখে মুখে ধরা জিলিপি নেই! দৌড়তে দৌড়তে ভুল করে খেয়ে ফেলেছে।

এরপর না কেঁদে আর উপায় কী?

অধীরের হাঁড়ি ভাঙা নিয়ে গত বছর স্পোর্টসে খুব গোলমাল হয়েছিল। ক্লাস নাইনের ছেলেরা গেম টিচারের কাছে গিয়ে আপত্তি জানাল—

'স্যার এ কখনও হতে পারে না। অধীরের রুমালে নিশ্চয় ফুটো আছে। সেবারও অধীর চোখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় হাঁড়ি ফাটিয়েছিল,

এবারও ফাটিয়ে দিল। পরপর দু'বার একই ঘটনা কী করে ঘটে স্যার? তাও কোনওরকমে হাঁড়ির গায়ে লাঠিটা লাগালে একটা কথা ছিল। একেবারে এক চান্সেই ফটাস! আপনি স্যার ওই রুমাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন।" ক্লাস টেনের ছেলেরা এ কথা শুনে রে রে করে উঠল। উঠবেই তো। অধীর তাদের ক্লাসের ছেলে। হাঁড়ি ভাঙা ইভেন্টের চ্যাম্পিয়ন। রুমালে ফুটো থাকার অভিযোগ তারা মানবে কেন? বলল—

"স্যার, ওদের কথা একদম শুনবেন না। হিংসেতে এই সব বলছে। আমরা সবাই দেখলাম, প্রতিটা রুমাল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে চোখ বাঁধা হয়েছে। অধীর এমনি এমনি চোখ বাঁধা অবস্থায় হাঁড়ি ভাঙেনি। ও তিন সপ্তাহ ধরে প্র্যাকটিস করেছে। প্র্যাকটিসের কোনও দাম নেই?"

ক্লাস নাইনের ছেলেরা বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, "হাঁড়ি ভাঙা প্র্যাকটিস করছে মানে! হাঁড়ি ভাঙা কি থ্রি হানড্রেড মিটার রেস? নাকি লং জাম্প যে প্র্যাকটিস করলে হয়। স্যার, এদের কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, ঘটনার পিছনে কোনও রহস্য আছে।"

অলকনন্দনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কীরকম রহস্য বলে তোমরা মনে করছ?"

ক্লাস নাইনের ছেলেরা হইহই করে বলল, "রুমালের রহস্য স্যার। ওই রুমাল পরীক্ষা করলেই সব ধরা পড়বে।"

অলকনন্দনবাবু অধীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "রুমালটা কী রকম ছিল অধীর?"

অধীর মিটিমিটি হেসে বলল, "নতুন রুমাল স্যার। সাদার পাশে নীল বর্ডার।"

ক্লাস টেনের ছেলেরা বলল, "অধীর ঘাবড়াসনি। তুই পকেট থেকে রুমালটা বের করে দেখিয়ে দে। আমরা তোর পাশে আছি।"

অধীর এখনও মিটিমিটি হাসছে। বলল, "আমার কাছে রুমাল নেই।"

ক্লাস নাইনের ছেলেরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। বলল,

"দেখলেন তো স্যার? ফুটো রুমাল চোখে বেঁধে হাঁড়ি ভেঙেছে, তারপর সেই রুমাল কোথায় সরিয়ে ফেলে এখন বলছে রুমাল নেই। স্যার অধীরের গতবারের হাঁড়ি ভাঙার মেডেলও কেড়ে নেওয়া হোক।"

এ বার 'হো হো' করে হেসে উঠলেন অলকনন্দনবাবু। হাসতে হাসতেই ক্লাস নাইনের ছেলেদের দিলেন জোর ধমক। বললেন, "অ্যাই চোপ। একদম চুপ করো তোমরা। আজ যারা হাঁড়ি ভাঙা ইভেন্টে অংশ নিয়েছে তাদের সবার চোখ বাঁধা হয়েছিল স্কুলের মাস্টারমশাইদের রুমাল দিয়ে। এক একজন প্রতিযোগীর জন্য এক একজন মাস্টারমশাইয়ের রুমাল। আর অধীরের রুমালটা ছিল আমার। এই দেখ।"

কথা শেষ করে অলকনন্দনবাবু পকেট থেকে একটা নীল বর্ডার দেওয়া নতুন সাদা রুমাল বের করলেন।

ক্লাস টেনের ছেলেরা চিৎকার করে উঠল, "হাঁড়ি ভাঙার হিরো অধীর হিপ হিপ হুররে...।"

তবে আমাদের স্পোর্টসের আসল হিরোর নাম বাদল। ক্লাস নাইনের রোগাভোগা, খোঁচা খোঁচা চুলের বাদল। তাকে নিয়ে আমাদের সারা বছর ধরে কৌতূহল। স্পোর্টসের দিন যত এগিয়ে আসে সেই কৌতূহল বাড়তে থাকে। ক্লাসে ক্লাসে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়। এমনকি মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত আমাদের জিজ্ঞেস করেন, "কীরে, এ বছর বাদলের প্ল্যান কী?" বাদলের প্ল্যানের খবর আমরা বলতে পারি না। কারণ, এই সময়টা সে একেবারে তালা বন্ধ করে ফেলে। এমনি তালা নয়। ডবল তালা। তারপর যেন দুটো চাবিই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করলে গম্ভীর মুখে বলে, "এখনও কিছু ঠিক করিনি। দেখি এখনও তো সময় আছে।"

অথচ প্রতি বছর সে এমন এক একটা কাণ্ড করে যে স্পোর্টসের শেষ ইভেন্ট 'যেমন খুশি সাজো' সবথেকে মজার হয়ে যায়। বাদলকে কেউ হারাতে পারে না। তার সাজ দেখে চমকে উঠতে হয়। শুধু সাজপোশাকে নয়, ভাবনাতেও সে হয় এক নম্বর। একবার গুপি গাইনের বাঘা সেজে এমন ঢোল বাজাল যে মাঠে হাততালি আর

থামতেই চাইছিল না। দু'বছর আগে সেজেছিল ফেলুদা। হাতে খেলনা রিভলভার নিয়ে স্কুলের পাঁচিল টপকে এল! সবথেকে মজা হয়েছিল যেবার হেডস্যারের সাজে ধুতি-পাঞ্জাবি আর কালো পাম্পসু পরে মস্ মস্ আওয়াজ তুলে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরপাক খেল। হাসিতে আমাদের পেট ফেটে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু হাসতে পারছি না। হাসব কী করে? একটু দূরেই চাঁদোয়ার নিচে খোদ হেডস্যার নিজে বসে আছেন। শুধু বসে আছেন না, তিনি তো বিচারকদের একজন। আমাদের মনে হল, বাদলের কপালে দুঃখ আছে। আশ্চর্যের বিষয়, সেবার হেডস্যার বাদলকে সবথেকে বেশি নম্বর দিয়েছিলেন!

তবে এবারের ঘটনা আগের সব ঘটনাকে ছাড়িয়ে গেল।

আমি, তন্ময়, অর্চি আর ঋজু ঠিক করলাম, এ বছর বাদল কী সাজবে আগে থেকে জানতেই হবে। যে করেই হোক জানতে হবে। তন্ময় বলল, "দাঁড়া, আগে খোঁজ নিয়ে দেখি বাদল কী খেতে ভালবাসে।"

অর্চি অবাক হয়ে বলল, "খাওয়ার সঙ্গে সাজের কী সম্পর্ক?"

তন্ময় মুচকি হেসে বলল, "আরে বাবা, আছে। ফেবারিট জিনিস খাবার সময় সকলের মনই একটু দুর্বল হয়। বাদলেরও হবে। আর তখনই গল্প করতে করতে ওর সাজের পরিকল্পনা জেনে নেব।"

সত্যি সত্যি তন্ময় খোঁজ নিয়ে এসে জানাল, বাদলের দারুণ ফেবারিট হল এগ রোল। তন্ময় বলল, "দে, সবাই চাঁদা দে। বেশি করে দিস। দুটো রোলের দাম লাগবে। এর নাম হল এগ রোল অপারেশন।"

ঋজু বলল, "এগ রোল অপারেশনে দুটো রোল লাগবে কেন? বাদলকে কি তুই রোল খাওয়াবি।"

তন্ময় রেগে গিয়ে বলল, "বোকার মতো কথা বলিস না ঋজু। বাদল দুটো খাবে কেন? আমাকে একটা খেতে হবে না? দুজনে রোল খেতে খেতে গল্প করব। নইলে ও সন্দেহ করে সতর্ক হয়ে যাবে।"

দুটো রোলের চাঁদা তোলা হল এবং শনিবার স্কুল ছুটির পর বাড়ি

ফেরার পথে তন্ময় সত্যি সত্যি বাদলকে রোল কিনে দিল। মন দিয়ে খাওয়া শেষ করে বাদল বলল, "খুব ঝাল লেগেছে রে, উপস্। মনে হচ্ছে লঙ্কায় কামড় দিয়েছি, উপস্! একটা আইসক্রিম খাওয়া রে, উপস্।"

তন্ময়ের খুব রাগ হল। কিন্তু কিছু করার নেই। আইসক্রিম না দিলে বাদল রেগে চলে যাবে। কিছুই বলবে না। তখন এগ রোলের টাকাটাও জলে যাবে। বাধ্য হয়ে নিজের পকেট থেকেই টাকা বের করে আইসক্রিম কিনল তন্ময়। সস্তার আইসক্রিম নয়, একেবারে দামি চকোবার। বাদল আইসক্রিমে আলতো কামড় দিয়ে বলল, "নে এবার বল।"

তন্ময় ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "কী বলব?"

বাদল অবাক হয়ে বলল, "বাঃ, বলবি না? কেন এগ রোল খাওয়ালি সেটা বল।"

তন্ময় লজ্জা পেয়ে বলল, "বাঃ, বন্ধুকে একটা রোল খাওয়াতে পারি না?"

বাদল নির্লিপ্ত মুখে বলল, "পারবি না কেন? তবে স্পোর্টস এসে গেছে তো, তাই সন্দেহ সন্দেহ হচ্ছে।"

তন্ময় দেখল বাদল ধরে ফেলেছে। আর ধরেই যখন ফেলেছে তখন সরাসরি কথাটা বলে ফেলাই বুদ্ধিমানের। সে আমতা আমতা করে বলল, "আসলে কী জানিস, 'যেমন খুশি সাজো'তে তুই যা করিস না...একেবারে ফাটাফাটি। হ্যাঁরে বাদল, এবার কী সাজবি? ভেবেছিস কিছু?"

বাদল আইসক্রিমের তলায় একটা হাত রেখে বলল, "দেখ তন্ময়, সাজের কথা আমি আগাম বলি না। কিন্তু এবার তুই এগ রোল খাইয়ে আমার মনটা দুর্বল করে দিয়েছিস। শুধু এগ রোল নয়, সঙ্গে আবার আইসক্রিমও। তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা ঠিক হবে না। তাই ভাবছি, তোকে বলেই ফেলব।"

তন্ময় রাস্তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়ল। বাদলের হাত ধরে বলল, "বলবি? বল তাহলে।"

বাদল আইসক্রিম শেষ করে কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল। তারপর হেসে

বলল, "ভূত। এবার আমি ভূত সাজছি। যা, এবার বাড়ি যা।"

পরের দিন তন্ময় স্কুলে এল মুখ কালো করে। আমরা ঘিরে ধরলাম। আমরা বললাম, "কীরে, তোর এগ রোল অপারেশন কী হল? কিছু জানতে পারলি?"

তন্ময় মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "অপারেশন ফেল করেছে। বাদল কিছুই বলল না। উল্টে এগ রোলের সঙ্গে একটা আইসক্রিমও খেল। শেষে রসিকতা করে চলে গেল।"

ঋজু বলল, "রসিকতা! কী রসিকতা?"

তন্ময় গজগজ করতে করতে বলল, "কী আবার বলবে? বলল, এবার নাকি ও ভূত সাজছে!"

আমরা হাল ছেড়ে দিলাম। না, এবারও জানা হল না।

স্পোর্টসের দিন 'যেমন খুশি সাজো' ইভেন্ট শুরু হতে সবাই নড়েচড়ে বসল। এক এক করে প্রতিযোগীদের নাম ডাকা হচ্ছে। হাততালি, হাসি আর চিৎকারের মধ্যে দিয়ে তারা মাঠে ঢুকছে। কেউ সেজেছে বাউল। কারও সাজ প্রফেসর শঙ্কুর মতো। কেউ আবার কোট-প্যান্ট আর টাই পরে হাতে বাবার ল্যাপটপ নিয়ে এসেছে! ক্লাস টেনের অনির্বাণ মাথায় গামছা বেঁধে ফুচকাওলা হয়েছে। ফুচকা ভর্তি একটা ঝুড়িও সঙ্গে এনেছে! তিনজন সেজেছে হ্যারি পটার। গোল গোল চশমা। এলোমেলো চুল। তিন সাইজের হ্যারি পটার দেখে সবাই হইহই করে উঠল। কিন্তু বাদল কোথায়? প্রথমে দু-একজনের মধ্যে ফিসফাস শুরু হল। সেই ফিসফাস খুব দ্রুত গোটা মাঠে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমাদের ডেকে মুকুন্দবাবু বললেন, "কী হল রে? তোদের বাদল কোথায়? এতবার নাম ডাকা হল..।"

অর্চি কাঁচুমাচু গলায় বলল, "বুঝতে পারছি না স্যার। খানিকক্ষণ আগেই দেখলাম মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।" আমি বললাম, "কোথায় চললি? বলল, সাজতে যাচ্ছি।"

মুকুন্দবাবু বললেন, "তা হলে তো ব্যাপারটা সিরিয়াস মনে হচ্ছে। হঠাৎ কিছু হয়ে গেল নাকি? একবার খোঁজ নিতে হয়। তোরা কেউ চট করে বাড়ি থেকে ঘুরে আয়।"

তন্ময় একটা সাইকেল জোগাড় করে রওনা দিল। বাদলের বাড়ি দূরে নয়। সাইকেলে যেতে-আসতে মিনিট পনেরো। তন্ময় ফিরে এল তেরো মিনিটের মাথায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "না, বাড়িতেও নেই।"

মুকুন্দস্যার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "স্পোর্টস শেষ হয়ে গেল। কিছু একটা করতে হবে। সেরকম হলে থানায় খবর দেব। আমি হেডস্যারকে জানাচ্ছি। তোরা এখন চুপচাপ থাক।"

আমরা চুপচাপ থাকলাম। কিন্তু তাতে লাভ হল না। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। বাদল ভ্যানিস! এর সঙ্গে আবার নানারকম গল্পও জুড়ল। কেউ বলছে, অপহরণ। কেউ বলছে, মনে হয় ডাকাত সেজে আসছিল। সত্যি ডাকাত ভেবে রাস্তাতেই পুলিস অ্যারেস্ট করেছে।

স্পোর্টস শেষ হলে চাপা টেনশনের মধ্যেই শুরু হল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। 'যেমন খুশি সাজো' ইভেন্টের পুরস্কারের সময় হেডস্যার উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, "প্রতিবার যে ছেলেটি এতে প্রথম হয় সেই বাদল এবার আসেনি। অথচ আমরা জানতে পেরেছি সে 'আসছি' বলে খানিক আগে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, তার কোনও সমস্যা হয়েছে। স্পোর্টস শেষ হয়ে গেলেই আমরা তার খোঁজখবর শুরু করব। যাই হোক, এবার 'যেমন খুশি সাজো'-তে ফার্স্ট হয়েছে...।"

ঠিক এমন সময় বাদলের গলা!

"এই তো আমি স্যার। এই তো আমি এসে গেছি।"

সবাই চমকে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, মাঠের একপাশ থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে সে! কোনও সাজগোজ নেই। একেবারে সাদামাঠা স্কুলের পোশাক। এমনকি পায়ে কালো বুটটা পর্যন্ত রয়েছে!

ছেলেদের ভিড় ঠেলে চাঁদোয়ার তলায় এসে দাঁড়াল বাদল। সে একই সঙ্গে হাঁপাচ্ছে এবং হাসছে!

মুকুন্দবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "কোথায় ছিলি তুই? অ্যাঁ, ছিলি কোথায়?"

বাদল হাসিমুখে বলল, "স্কুলে ঢুকে ফাঁকা ক্লাসরুমে লুকিয়ে বসে

ছিলাম।"

মুকুন্দবাবু ধমকে উঠলেন, "ফাঁকা ক্লাসরুমে লুকিয়ে ছিলি মানে! রসিকতা হচ্ছে? কান টেনে ছিঁড়ে দেব। এতবার নাম ডাকা হল, শুনতে পাসনি?"

বাদল কাঁচুমাচু মুখে বলল, "হ্যাঁ, শুনতে পাব না কেন স্যার? খুব শুনতে পেয়েছি।"

এবার হেডস্যার কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "শুনতে পেয়েছ তো আসনি কেন?"

বাদল মাথা নামিয়ে বলল, "কী করে আসব স্যার? এবার যে আমি ভূত সেজেছি। ভূত কি দেখা যায়? ভূত তো অদৃশ্য। সেই জন্যই তো লুকিয়ে ছিলাম।"

'যেমন খুশি সাজো' এখন খেলাধুলোর মধ্যে পড়ে না, কিন্তু তখন পড়ত। খুব বেশি মাত্রাতেই পড়ত। আর সেবারও এই খেলায় প্রথম হল ক্লাস নাইনের বাদল।

পড়তে বসা

মাস্টার মশাইরা বলেন, "অঞ্জনকে দ্যাখ্। দেখে শেখ্।" সত্যিই শুধু আমরা ক্লাস সেভেনের ছেলেরা শুধু নই, অঞ্জনকে দেখে আমাদের এই পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সব ক্লাসের ছেলেরাই। তাকিয়ে দেখার মতই ছেলে বটে সে। ক্লাস সেভেনের একটা ছেলে যে এত পড়াশুনো করতে পারে তা কেউ দেখা তো দূরের কথা, কানেও কখন শোনেনি।

আমাদের সঙ্গে তমাল বলে একটা ছেলে পড়ে। তমালের কাজই হল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়ে এর বাড়ি, ওর বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। ঘুরে ঘুরে সে তথ্য যোগাড় করে ক্লাসের কে কতক্ষণ পড়াশুনো করছে। সকাল সকাল সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, এই কাজে ব্যস্ত থাকায় তমাল নিজে পড়াশুনো করার একেবারে সময় পায় না ঠিকই তবে তথ্য সে যা যোগাড় করে তা একেবারে নিখুঁত। শুধু যোগাড় করা নয় সেগুলো সে একে-ওকে জানিয়েও দেয়। যেমন, কৃষ্ণেন্দু ভোর পাঁচটা থেকে পড়তে বসেছে। ভূগোলের আফ্রিকা মহাদেশ পুরো মুখস্থ হয়ে গেছে। অনিন্দ্যকে সে একথা জানিয়ে এল। আবার পিন্টুকে গিয়ে বলে এল, অনিন্দ্যর বাড়িতে চুনকাম হচ্ছে তাই

সকালটা সে তেমন পড়তে পারেনি। ছাদে বসে শুধু পাটিগণিত করেছে। এরপর অনুপমের বাড়ি। সেখানে কৃষ্ণেন্দু, অনিন্দ্য এবং পিন্টুর পড়ার হিসেব কোনরকমে দাখিল করেই সে বন্‌বন্‌ করে সাইকেল চালিয়ে চলে যাবে সুমনের কাছে। সেখান থেকে মানস, রথীন, দেবুর কাছে। সন্ধেবেলাতেও তমালের ওই একই কাজ। বলা বাহুল্য পরীক্ষা সামনে থাকলে এই কাজ এতই বেড়ে যায় যে তমালের এক মিনিটও নিজের বই খুলে বসার সময় থাকে না। তখন আবার তথ্য, পরিসংখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অ্যাডভাইসও দেয়। যেমন অনিন্দ্যর বাড়িতে গিয়ে বলে এল, "সে কিরে! তুই এখনও ম্যাপ খাতা শেষ করিসনি। তাড়াতাড়ি কর। সুমনের তো খাতা শেষ করে মলাট পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে। নিজের চোখে দেখে এলাম।" কিংবা সুমনের পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "ছি ছি, সুমন তুই আজও আট নম্বর চ্যাপ্টারের অঙ্ক নিয়ে পড়ে আছিস! অনিন্দ্য দেখলাম এগারো শেষ করে বারো নম্বরটা ধরেছে।"

আমরা দু-একবার তমালকে জিগ্যেস করেছিলাম, "হ্যাঁরে তমাল তুই কখন পড়বি? তমাল বলেছে, "খেপেছিস্। এত কাজ, পড়ার সময় কই।" সেই তমালই অঞ্জনের পড়ার যা হিসেব আমাদের দিয়েছে তা এইরকম—

ভোর সাড়ে চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠা। সময় যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য বালিশের পাশেই বই থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পড়তে বসে যাওয়া। দাঁত মাজতে মাজতে সেই পড়া মনে মনে আওড়ানো। ছাদে মর্নিং ওয়াক করতে করতে পড়া। জলখাবার খেতে খেতে পড়া। সাড়ে ছটার সময় ভূগোলের মাস্টারমশাই চলে আসবেন। সাড়ে সাতটায় ইতিহাসের, সাড়ে আটটায় ইংরেজির, সাড়ে নটায় অঙ্কের। মাস্টার মশাইরা চলে গেলে স্নান, খাওয়া। তখনই সকালের পড়াগুলো সব পরপর মুখস্থ বলে যাওয়া। এরপর চারটে পর্যন্ত স্কুল। তখনও টিফিনে পড়া। ছুটি হলেই দৌড়ে বাড়ি। সাড়ে চারটেয় বাংলার মাস্টারমশাই, পৌনে ছটায় বিজ্ঞানের, আটটা বেজে দশ মিনিটে কর্মশিক্ষার, সাড়ে ন'টার সময় সংস্কৃতর। এবং সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়, তমাল আমাদের জানিয়েছে, অঞ্জনের জন্য একজন ড্রিলের মাস্টারমশাইও

বাড়িতে আসেন। রাত সোয়া দশটা নাগাদ নাকি দেখা গেছে তিনি ছাদে অঞ্জনকে এক দুই, এক-দুই-তিন করে ড্রিল শেখাচ্ছেন! এরকম ছেলেকে বাবা, মা, দাদা এবং মাস্টারমশাইরা যে 'আদর্শ' হিসেবে বার বার আমাদের সামনে আনবেন এ আর আশ্চর্য কী?

এদিকে বাড়িতে স্কুলে শুধু 'অঞ্জন-অঞ্জন' শুনে আমরা তো একেবারে তিতিবিরক্ত। এ কেমন পড়ার ছিরি? আমরা অনেক ভেবেচিন্তে একটা ফন্দি করলাম। ঠিক হল এবার আমরা সরস্বতী পুজোটা করব একেবারে অঞ্জনদের বাড়ির উল্টোদিকের মাঠে। সেই মত সব ব্যবস্থা হল। রাত জেগে প্যান্ডেল বাঁধলাম। মনোজ খুব ভাল বাজনা বাজাতে পারে। সে কোথা থেকে জানি একটা ঢাক যোগাড় করে আনল। এবার হতে না হতেই সেই ঢাক বাজতে শুরু করল, ধাঁই না; না, ধাঁই না না গিজ গিনিতা গিজ গিনিতা। সঙ্গে তাপসের কাঁসর-ঘণ্টা। আমরা বললাম, 'দেখি ব্যাটা অঞ্জন এমন দিনেও কত পড়ে!' সরেজমিনে দেখে আসতে তমাল পিছনের দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে অঞ্জনদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই তমাল ফিরে এসে জানাল, ঘরের সবকটা জানলায় দরজায় মোটা মোটা পর্দা টাঙিয়েছে অঞ্জন। ভেন্টিলেটারে সোয়েটার। এমনকি নিজের দুকানে তুলো পর্যন্ত গুঁজেছে! এত করেও ঘরে যেটুকু ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে তা চাপা দিতে অঞ্জন ইতিহাস বই খুলে বাবর, আকবর, শেরশাহ, লর্ডকার্জন, বলে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে!

'যা বাবাঃ' বলে আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। পরীক্ষার রেজাল্ট যেদিন বের হল, সেদিন দেখা গেল অঞ্জন ভূগোলে সাত, ইতিহাসে তের, অঙ্কে সতের, বিজ্ঞানে নয় পেয়েছে। অঞ্জনের এই রেজাল্ট দেখে আমরা সত্যিই একটু দুঃখ পেয়েছিলাম। বেচারি এত খাটাখাটনি করল! সব একেবারে জলে গেল। অঞ্জন কিন্তু একটুও মুষড়ে পড়ল না। বলল, 'বাড়ি যাই। পড়তে বসতে হবে।'
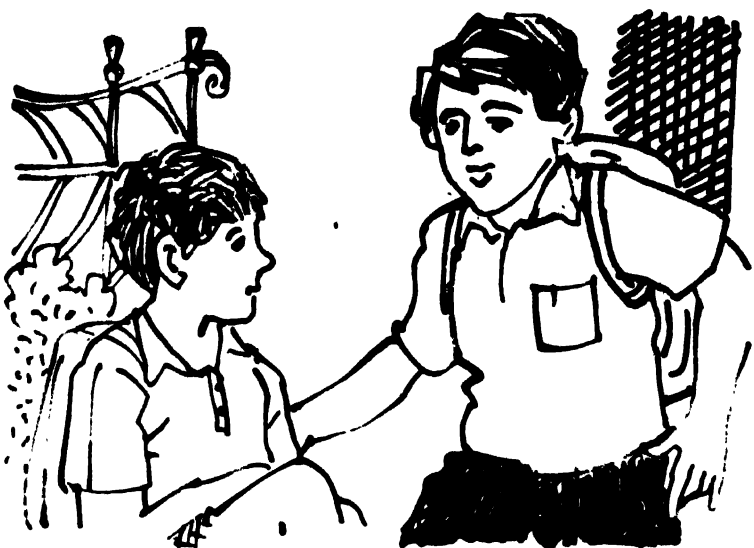
হিংসুটে

রঘুনাথের মত হিংসুটে ক্লাস সেভেনে কেন, গোটা ইস্কুলেই আর কেউ নেই। বন্ধুরা তার নাম রেখেছে হিংসুটে নাথ।

সব কিছু নিয়ে রঘুনাথ হিংসে করে। পিন্টু কেন ক্লাসে ফার্স্ট হয়, আমি কেন হই না? তপন কেন ফুটবল টিমে চান্স পেল, আমি কেন পেলাম না? বিশ্বরূপ কেন 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে লক্ষ্মণের পার্ট পেল, আমি কেন পেলাম না? অমিয় কেন ভূগোলে বিরাশি পেল, আমি কেন পেলাম না? অজয় কেন গান গাইতে পারে, আমি কেন পারি না? এইরকম সব।

হিংসে করতে করতে রঘুনাথের এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে ক্লাসে কেউ মাস্টারমশাইয়ের কাছে মার খেলে পর্যন্ত সে হিংসে করে বসে। আসলে হিংসে করতে গিয়ে যেসব গুলিয়ে ফেলে। এরকম ছেলেকে কেই বা পছন্দ করবে? তাই রঘুনাথকেও তার বন্ধুরা এড়িয়ে চলে। নইলে ছোটখাটো সব ব্যাপার নিয়েই তো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। এই তো সেদিন বিদ্যুৎ ওর স্ট্যাম্পের অ্যালবাম নিয়ে এসেছিল। ক্লাসে একেবারে হৈ হৈ পড়ে গেল। টিফিনের সময়

সবাই হুমড়ি খেয়ে সেই অ্যালবাম দেখছিল আর পঞ্চমুখে বিদ্যুতের প্রশংসা করছিল। বিদ্যুৎ নেতার মত মুখ করে গর্বের হাসি হাসছিল।

রঘুনাথের তো এই কাণ্ড দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে। সে আর সহ্য করতে না পেরে দুম করে বলে বসল, "ওসব জাল স্ট্যাম্প।" ব্যস্, যা হবার তাই হল। বিদ্যুৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কুস্তি, বক্সিং, ক্যারাটে কিছুই বাকি রইল না। অন্যরা কোনক্রমে দুজনকে সরিয়ে দেয়।

আর একদিন মধু এসে বলল, "আমার সেজমামা আফ্রিকা ঘুরে আজ ফিরলেন।"

অমনি সবাই মধুকে ঘিরে বসল। মধু তখন তার মামার গা ছম্‌ছমে আফ্রিকা ভ্রমণের গল্প বলতে শুরু করল বন্ধুদের। পরদিন রঘুনাথ ক্লাসে এসেই ঘোষণা করল, "আফ্রিকা না ছাই, মধুর সেজমামা সুন্দরবনের গোসাবা থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছেন। আমার ছোট কাকার এক বন্ধু তো ওই অপিসেই কাজ করেন।" এরপর কি আর মধুর পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব? তবে সেদিন শুধু চুলের ওপর দিয়ে মারপিট শেষ হয়েছিল। এই হল রঘুনাথ। রঘুনাথকে তার বন্ধুরা হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছে। কিন্তু পরশু দিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

সেদিন রঘুনাথ ছুটির পর লাইব্রেরিতে বসে টিনটিনের নতুন বইটা পড়ছিল। নতুন বই অন্য কেউ আগে পড়ে নেবে একথা সে কল্পনাও করতে পারে না। যখন সে ইস্কুল ছেড়ে বের হচ্ছে, তখন সব ফাঁকা। সন্ধে হয় হয়। ঠাণ্ডা বাড়ছে। হনহনিয়ে ইস্কুল গেটের মুখে এসে দেখে দারোয়ানের বেঞ্চিতে জবুথবু হয়ে বসে আছে তাদেরই ক্লাসের কল্যাণ। আরে, এখনও কল্যাণ কেন? থমকে দাঁড়ায় রঘুনাথ। তার হিংসুটে মন খচখচ করে ওঠে। ব্যাপারটা কী? "কি রে কল্যাণ? কী হয়েছে?" জিগ্যেস করে সে।

কল্যাণ প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই বলে "জ্বর এসেছে রে। উঠতে পারছি না।" হিংসে করবার মত কিছু ঘটেনি দেখে যেন নিশ্চিন্ত হল রঘুনাথ। বলল, "তা বসে আছিস কেন? গায়ে তো দেখছি সোয়েটারও

নেই। একটা রিকশা ডেকে বাড়ি চলে যা।"

কল্যাণ কাঁচুমাচু মুখে জানাল, "রিকশ ভাড়া নেই।" কথা শেষ হলে রঘুনাথ চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ কী ভেবে ফিরে এল সে। নিজের পকেট থেকে বের করল দুটো টাকা। চারপাশ ভাল করে দেখে জোর করে সেগুলো ধরিয়ে দিল কল্যাণের হাতে। তারপর ফিসফিস করে বলল, "কাউকে বলিস না যেন। সব যা হিংসুটে। তোকে সাহায্য করে বাহাদুরিটা নিতে পারল না বলে হিংসে করবে।" কল্যাণ অবাক।

লজ্জা

আমাদের ক্লাস সেভেনে নতুন ক্লাস টিচার এলেন অনিল মহান্তি। চুলগুলো খাঁড়াখাঁড়া, এক গাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো লাল আর বন-বন করে ঘুরছে। ভয়ঙ্কর রাগী। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকেই বললেন, "কোনওরকম বেয়াদপি করেছিস তো পিঠের ছাল তুলে দেব।"

শুধু এই হুঙ্কারেই তিনি থামলেন না। প্রথমদিনই তিনি প্রত্যেককে এক ঘা, দু'ঘা করে দিয়ে জানালেন, "প্রথম রাতেই বেড়াল মেরে রাখলাম। আশা করি তোরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলি তোদের নতুন ক্লাস টিচার কেমন।"

বুঝব আর কী? আমরা তো ভ্যাবাচাকা খেয়ে বসে রইলাম আর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। মহান্তিবাবুর রাগের খবর দাবানলের মত স্কুলে ছড়িয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল ফিসফিস করে আলোচনা, পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এমন রাগী মাস্টারমশাই আগে কখনও আসেননি।

সেই থেকে প্রথম পিরিয়ডটা আমাদের কাটতে লাগল ভয়,

উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায়। কারণে, অকারণে, যখন-তখন, যে কোনও সময়, যে কারোর ওপর মহান্তিবাবু রেগে যেতেন। আর তার কপালে জুটত অশেষ লাঞ্ছনা। তিনি স্কুলের একেবারে কাছেই বাড়ি ভাড়া নিলেন। একা মানুষ। সকাল সকাল চলে আসেন স্কুলে। বাড়ি ফেরেন সবার শেষে। কামাই বলে কোনও ব্যাপারই নেই। ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁর কোনও অসুবিধাই হয় না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'পা হাঁটলেই তো স্কুল। সবকিছুই যেন আমাদের বিরুদ্ধে গেছে।

এরকমভাবেই চলছিল। হঠাৎ মহান্তিবাবু একটা কাণ্ড করলেন। একদিন ক্লাসে এসে বললেন, "দ্যাখ, বেশ কয়েকদিন তোদের সঙ্গে থাকলাম। দেখলাম তোরা সবাই বদ আর পাজি। তবে তোদের মধ্যে কয়েকজন আছে যারা বেশি পাজি। আমি অনেক ভেবেচিন্তে এরকম পাঁচজনের একটা লিস্টি তৈরি করেছি। এরা হল বাবলু, রাতুল, অঞ্জন, কৌশিক আর সুব্রত। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় এরা সবার থেকে কম নম্বর পেয়েছে। এদের দ্বারা কিস্যু হবে না। ছাত্র তো নয়, এক একটা গাধা। শুধু তাই নয়, এরা হল পচা ফলের মত। ঝুড়িতে থাকলে অন্যগুলোও পচে যাবে। তাই আমি ঠিক করেছি, এই পাঁচজন পাজির সঙ্গে কেউ মিশবি না। ওদের একঘরে করা হল। যদি দেখি ওদের কারোর সঙ্গে কেউ কথা বলেছিস, তাহলে কপালে খুব দুঃখ আছে।"

মহান্তিবাবুর কথার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, তাঁর মুখের ওপর কথা বলার সাহসই আমাদের কারোর নেই। হতে পারে বাবলুরা পড়াশোনাতে তেমন ভাল নয়, হতে পারে মাথায় নানারকম দুষ্টুবুদ্ধি খেলে, তা বলে ওদের বয়কট করতে হবে? এ যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড। ক্লাস সেভেনের কেউ এতে খুশি নই। কিন্তু উপায় কী?

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গণ্ডগোল শুরু হল। মহান্তিবাবু তো হুকুম দিয়েই খালাস। কিন্তু ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে আমাদের। কৌশিককে বাদ দিয়ে টিম করতে হল। ক্লাস নাইনের কাছে চারটে গোল খেতে হল। সুব্রত ছাড়া ক্যারাম কম্পিটিশনে নামলে যা হওয়ার তাই হল। ক্লাস সেভেন ফার্স্ট রাউন্ডেই বাতিল। রাতুল পরপর দু'বার আন্তঃজেলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় মেডেল এনেছিল। এবার রাতুল বাদ, মেডেলও

বাদ গেল। অঞ্জন ছিল বলে এঁকে দেয়—, আমরা দেওয়াল পত্রিকায় ফার্স্ট হয়ে আসছিলাম এতদিন। এবছর অঞ্জনকে দিয়ে আঁকানো গেল না, দেওয়াল পত্রিকায় আমরা লাস্ট হলাম। বাবলু আমাদের ক্লাসে সবথেকে ভাল অভিনয় করে। স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশনে সেই আমাদের ক্লাস থেকে প্রতিনিধিত্ব করে। এবার আর কেউ চান্স পেল না।

পরপর এইসব ঘটনায় আমাদের ক্লাস সেভেনের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়ল। যে 'পাজি ছেলে'দের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করতাম, তাদের একঘরে করে দিয়ে আমরাই সবকিছুতে পিছিয়ে যেতে থাকলাম। তবু আমাদের কিছু করার নেই। ক্লাস টিচারের হুকুমে আমরা ঐ পাঁচবন্ধুর সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি।

এরকম সময় একটা ঘটনা ঘটল। টানা তিনদিন মহান্তিবাবু এলেন না। আমরা খুশি। চারদিন হল, পাঁচদিন হল, ছ'দিন হল। মহান্তিবাবু এলেন না। আমরা দারুণ খুশি। সাতদিন হল, আটদিন হল তাও মহান্তিবাবুর দেখা নেই। আমাদের মধ্যে খুশির একেবারে বাঁধ ভেঙে পড়ল। আমরা ঠিক করলাম আরও দু'দিন যদি উনি না আসেন তাহলে আমরা পিকনিক করতে যাব।

পরদিন আমরা যখন ক্লাসে জটলা করে পিকনিকের মেনু তৈরি করছি তখন বাবলু হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, "মহান্তিবাবুর খুব অসুখ করেছে। প্রচণ্ড জ্বর। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন।"

বলা বাহুল্য মহান্তিবাবুর অসুখ নিয়ে আমাদের কারোরই কোনও মাথাব্যথা নেই। পিন্টু বলল, "এ তো ভাল খবর। ভাল করে খোঁজ নিয়ে এসে বল তো দিন পনের আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারব কিনা?" তাপস বলল, "রোজ থাপ্পড় খেয়ে খেয়ে আমার ফোলা গালদুটো কেমন বসে গেছে। বয়ে গেছে আমার ওকে দেখতে যেতে।"

বাকিরাও একমত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে পিকনিকের আলোচনায় মন দিল। আমরা ঠিক করলাম, বাবলু, কৌশিক, অঞ্জন, রাতুল, সুব্রতদেরও সঙ্গে নেব।

পিকনিক খুব ভাল হল। খুব হৈচৈ হল। আলুর দমটা পুড়ে যাওয়াতে সবাই চেয়ে চেয়ে ওটাই খেতে লাগল। সবাই এসেছিল, আসেনি শুধু ঐ পাঁচজন। আমরা ভাবলাম, ওদের অভিমান হয়েছে।

আরও সাতদিন বাদে মহান্তিবাবু এলেন। চুলগুলো আর খাড়া খাড়া নেই। তেল দিয়ে পাট করে আঁচড়ানো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি নেই। পরিষ্কার করে কামানো। এমনকি চোখ দুটোও আর অত লাল নয়। ক্লাসে ঢুকে তিনি শান্তভাবে একগাল হেসে বললেন, "তোদের পিকনিকের খবরটা আমি জেনে ফেলেছি। কিন্তু তোরা তো জানতে পারিসনি, তোদের ক্লাসের ঐ পাঁচজন পাজি সাতদিন ধরে আমার সেবা করে আমাকে ভাল করে তুলেছে। মাস্টারমশাইয়ের অসুখ করেছে বলে পিকনিক করে তোরা নিজেদেরই লজ্জায় ফেলেছিস। আর ঐ পাঁচ পাজি লজ্জায় ফেলেছে আমাকে। তোদের লজ্জাটা দুঃখের। আমারটা আনন্দের।"

ফুলডুংরি

সেবার ঠিক হল, আমরা দেবুর ছোটপিসির বাড়িতে বেড়াতে যাব। বেশি দিনের জন্যে নয়, মাত্র দু'দিনের জন্যে। দু'দিন ধরে খুব মজা হবে।

দেবুর ছোটপিসি থাকেন ফুলডুংরিতে। দেবু বলেছে, "ওরকম সুন্দর জায়গা খুব কমই আছে।" ওখানে একটা চমৎকার পাহাড় আছে। ছোটখাটো পাহাড়। ইচ্ছে করলেই সেই পাহাড়টা বেয়ে একদম ওপরে উঠে যাওয়া যায়। আর ওই পাহাড় থেকে নেমে আসছে ফুটফুটে সাদা একটা ঝরনা। খুব গরমের সময়েও নাকি সেই ঝরনার জল একটুও শুকোয় না। সব থেকে বড় কথা হল, ওই ঝরনার দু'পাশে রয়েছে গাছের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জঙ্গল। ওখানে পিকনিক করাটা নাকি একটা দারুণ ব্যাপার!

এসব কথা অবশ্য আমরা দেবুর মুখেই শুনেছি, আমরা যারা পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ি তারা তো কেউ কখনও ফুলডুংরিতে যাইনি। আমরা তাই জানিও না যে ফুলডুংরি সত্যি কেমন দেখতে। তবে দেবুর মুখ থেকে আমরা মাঝে মাঝেই ফুলডুংরির

লোভনীয় গল্প শুনি। তাই এবার আমরা ক্লাসের কয়েকজন ঠিক করেছি ফুলডুংরিতে যাবই যাব।

কিন্তু কে কে যাবে? এটা নিয়ে খুব গণ্ডগোল শুরু হল। আমরা তো এই ক্লাসে চল্লিশজন পড়ি, তার মধ্যে আটতিরিশজনই বলল, 'আমি যাব।'

দেবু এই শুনে একেবারে বেঁকে বসল। "না ভাই, এভাবে তো যেতে পারব না। আমার পিসিমার বাড়িতে দুটো ঘর, একটা বারান্দা, একটা ছাদ। আটতিরিশ জন কোথায় থাকবে!"

মানস বলল, "তাহলে আমরা ছাদেই থাকব। বেশ মজা হবে।"

দেবু বলল, "ছাদে লাফালাফি করলে তোমাদের মজা হতে পারে, কিন্তু আমার পিসিমা তো ছাদের তলায় থাকবেন, তাঁর মোটেই মজা হবে না। খুব বেশি হলে চারজন যেতে পারে।"

দেবুর এই কথা শুনে আমরা আঁতকে উঠলাম।

মোটে চারজন!

দেবু বলল, "হ্যাঁ, মোটে চারজনই। আমাকে নিয়ে পাঁচজন। এবার তোমরা নিজেরা ঠিক কর কে কে যাবে।"

এই কথা ঘোষণা করে দেবু গম্ভীর মুখে পাটিগণিতের বই খুলে বিড় বিড় করে কী সব পড়তে লাগল।

এবার যে ঘটনা ঘটবার সেটাই ঘটল। পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ক্লাস সেভেনের ছেলেদের মধ্যে ভীষণ রকম হট্টগোল বেধে গেল। সকলেই ফুলডুংরি যেতে চাইল। এমনকি প্রথমে যে দু'জন 'যাব না' বলেছিল তারাও বলল, 'যাব'!

সত্যি কথা বলতে কী অমন সুন্দর জায়গায় বেড়াতে গেলে কাকে বাদ দিয়ে কাকে নেওয়া হবে? পাহাড়, ঝরনা, জঙ্গলে যেতে তো সবাই চাইবেই, সে আর আশ্চর্যের কী! তার ওপর আবার নাকি দুপুরবেলা ওই ঝরনা থেকে জলের কণা চারিদিকে উড়ে বেড়ায়। কেউ ওখানে গেলে তার চোখেমুখে এসে লাগে। এই গল্প দেবু আমাদের সকলকে করেছে। ওই তো যত নষ্টের গোড়া। ও আরও বলেছে যে ওই সময়টা নাকি পাহাড়ের সারা গা কৃষ্ণচূড়া ফুলে লাল হয়ে থাকে। বিকেলের

ঝোড়ো হাওয়ায় সেই ফুল উড়ে এসে ঝরনার জলে পড়ে। তখন মনে হয় ঐ ঝরনাটা জলের নয়, ফুলের ঝরণা। ঝরনাটার এমনি নাম তো ডুংরি, আর ওইরকম ফুল পড়ে বলে নাম হয়েছে ফুলডুংরি। আর এসব তো আমরা কোন বইতে পড়িনি, আমাদের দেবুই বলেছে। সেই কারণেই তো সবাই ওখানে যেতে চাইছে।

রথীন বলল, 'তাহলে আমরা হেডস্যারকে বলি যে আপনি বেছে দিন কোন চারজন দেবুর সঙ্গে যাবে।'

বিষ্ণু বলল, "তার থেকে আমাদের ক্লাসটিচার বিমানবাবুকে বলি।"

শুভাশিসের মত হল, "দেবুই ঠিক করুক কাকে ও সঙ্গে নেবে।"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোন কথাই শোনা হল না।

দু'দিন কেটে গেল। তার মধ্যে দেবু আমাদের ক্লাসের অনেকের কাছে অনেকরকম উপহার পেল। এই যেমন ভুটানের তিনকোনা স্ট্যাম্প, এক বছরের বাঁধানো অরণ্যদেব, শচীন তেণ্ডুলকরের ছবি—এইসব।

দেবু এই দু'দিন ফুলডুংরি সম্পর্কে আরও দুটো তথ্য ক্লাসের সবাইকে জানিয়েছে। এক নম্বর হল, ফুলডুংরি ঝরনার ভেতর এমন চমৎকার করে পাথর সাজানো আছে যে যেখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্নান করা যায়। আর, দু নম্বর তথ্যটা হল, ওর ছোটপিসির বাড়িতে একটা নীল রঙের দুর্দান্ত তাঁবু আছে, ইচ্ছে করলে সেটাকে জঙ্গলের মধ্যে টাঙিয়ে সারা দিন থাকা যায়।

এই তথ্য দুটো জানানোর পর দেবুকে কেউ হজমির প্যাকেট দিল, কেউ ওর অ্যাকোরিয়ামের জন্য রঙিন মাছ এনে দিল শিশি করে, কেউ ঘুড়ি এনে দিল।

সবই দেবু গম্ভীর মুখে নিল। কিন্তু চারজনের বেশিতে কিছুতেই রাজি হল না। শুধু বলল, "তোমরা এবার ঠিক করে নাও কে কে যাবে। আমরা রবিবার ভোরে রওনা হচ্ছি। ছোটপিসিকে সেইমত চিঠি লিখে দিয়েছি।"

একথা শুনে তো ক্লাসে লাফালাফি শুরু হয়ে গেল। হাতে মাত্র কটা দিন। এর মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনকে বাদ দিতে হবে!

ফুলডুংরি যাওয়া নিয়ে ক্লাস সেভেনের ছেলেদের মধ্যে যে খুব ঝগড়া লেগেছে সে কথা পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সকলে জেনে ফেলল। কোন কোন ক্লাসের ছেলেরা ঠাট্টা করতেও শুরু করল।

এই নিয়ে আমাদের অনুপমের সঙ্গে এইটের সুপ্রিয়র একদিন হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেল। শুক্রবার দেবু স্কুলে এসে বলল, "কাল আমি স্কুলে আসব না। গোছগাছ করতে হবে। তোমরা যে চারজন আমার সঙ্গে যাবে রবিবার ভোরে স্টেশন চলে যাবে। ট্রেনে করে আমরা চলে যাব রসুইনগর, সেখান থেকে বাসে পটাসের হাট, পটাসের হাট থেকে ভ্যানরিকশায় আধঘণ্টা ফুলডুংরি। বিকেলের আগেই পৌঁছে যাব। সেদিন কেউ যেন দেরি কোরো না। চারজনই ঠিক সময়ে চলে এসো। ছটা পঞ্চান্নর ট্রেন ধরতে না পারলে দেরি হয়ে যাবে। পিসিমা আবার লুচি-আলুর দম তৈরি করে বসে থাকবেন কিনা।"

দেবুর এই কথাগুলো আমাদের কানে যেন বিষ ঢেলে দিল, গায়ে যেন কাঁটা বিঁধিয়ে দিল। শনিবার দিন হাফ ছুটির পর আমরা ক্লাসের উনচল্লিশ জন মিটিঙে বসলাম।

প্রণব বলল, "কোন চারজন যাবে ঠিক করতে হবে এখনই। আর সময় নেই।"

পিন্টু বলল, "তা হবে না। গেলে আমরা সবাই যাব।"

অশোক বলল, "ঠিক কথা। কেউ বাদ যাবে না। ফুলডুংরির মত সুন্দর জায়গায় আমরা সবাই বেড়াতে যেতে চাই।"

বিষ্ণু বলল, "একশো ভাগ ঠিক। হয় সবাই যাবে, নয় কেউ যাবে না।"

মানস বলল. "সবাইকে তো দেবু নিয়ে যাবে না।"

রথীন বলল, "ফুলডুংরি কি দেবুর জায়গা যে ও ঠিক করবে ক'জন যাবে?"

শুভাশিস বলল, "আমরা তো ফুলডুংরি চিনি না। আর চিনে যদিবা পৌঁছোই, সেখানে গিয়ে এতজন থাকবে কোথায়? এতজন মিলে তো আর গাছতলায় থাকা যায় না? তাছাড়া বাড়ি থেকে

ওরকমভাবে ছাড়বেই বা কেন?”

এমন সময় সোমনাথের মাথায় কী যেন পরিকল্পনা এল। সে লাফিয়ে উঠল। বলল, “হুররে! আইডিয়া পাওয়া গেছে। আমরা সবাই যাব। সক্কলে কাল চলে আয় স্টেশনে। দেবুর আগেই আমরা ট্রেন ধরব।”

সোমনাথের কথা শুনে আমরা জোর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কিন্তু ও আর একটা কথাও না বলে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

এরপরের ঘটনাটা একেবারে রোমাঞ্চকর। সেটা এরকম—

রবিবার সকালে সোমনাথের নেতৃত্বে একদল ছেলে ঝপাং করে ট্রেনে উঠে পড়লাম। এক একটা করে স্টেশন আসে আর সোমনাথ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়। এরকম করে ঘণ্টা দুই পরে হঠাৎ সোমনাথ একটা স্টেশনে বলল, “এই নেমে আয়, নেমে আয়, এসে গেছি।”

আমরা তো অবাক! এত তাড়াতাড়ি এসে গেল! তবু নেমে পড়লাম হই হই করে।

স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। দু'একটা দোকান-বাজার। পেরিয়ে গেলাম তাও। তার পরই মাটির রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে আমরা বেসুরো গলায় গান গাইতে গাইতে গেলাম। কিছুটা দূরে যেতেই একেবারে খোলা একটা ধূ-ধূ মাঠ। উঁচু একটা ঢিবি। যতদূর চোখ যায় বাড়ি-ঘর কিছু নেই। শুধু এখানে ওখানে বড় বড় কতকগুলো গাছ, ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একছুটে ঐ ঢিবির ওপরে উঠলাম। ওমা! ঢিবির পিছনে একটা পুকুর লুকিয়ে আছে! আর সেটার টলমলে জলে একদল হাঁস এমনভাবে সাঁতার কাটছে যেন ওরা সবাই ওই পুকুরটার রাজা!

প্রণব ‘ফ্যানটাস্‌টিক!’ বলে ওই পুকুর পাড়েই একটা ডিগবাজি খেল। রথীন ‘দুর্দান্ত!’ বলে এক চক্কর দৌড় দিয়ে এল মাঠে। মানস “বাঃ! বাঃ! বলে তরতরিয়ে উঠে গেল গাছ বেয়ে।”

সোমনাথ ঢিবির মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়ার কায়দায় বলল, “বন্ধুগণ, এই হল আমাদের ফুলডুংরি। দেবুর একার ফুলডুংরিতে ঝরনা পাহাড়, জঙ্গল আছে, আর আমাদের সকলের

ফুলডুংরিতে মাঠ, পুকুর গাছ আর আকাশ আছে। এই ফুলডুংরিটা কম কিসের?''

আমরা সবাই মিলে বলে উঠলাম 'একটুও না।'

এরপর সারাদিন আমরা ফুলডুংরির মাঠে খেললাম, পুকুরে সাঁতার কাটালাম, গাছে চড়লাম, চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখলাম, পাখির ডাক শুনলাম, টিফিনবক্স খুলে ভাল করে খেলাম। তারপর সন্ধেবেলায় ট্রেন ধরে পবনপুর ফিরে এলাম।

আমরা ট্রেনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ঠিক করেছি যে পরেরবার আমরা অন্য আর একটা ফুলডুংরিতে যাব। আর দেবুকে জোর করে নিয়ে যাব।

প্রধান অতিথি

এই বছর থেকে আর আমাদের পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কোনও 'প্রধান অতিথি' থাকবে না। একথা শুনে অনেকেরই হয়ত মন খারাপ হয়ে যাবে, বিশেষ করে আমাদের এই এলাকায় যেসব মান্যিগণ্যি ব্যক্তিরা আছেন, আগামী দিনে 'প্রধান অতিথি' হওয়ার সুযোগ যাঁদের ছিল তাঁরা যে যথেষ্ট কষ্ট পাবেন তা আমরা জানি। তবু এই সিদ্ধান্তের জন্য আমরা, পবনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র এবং মাস্টারমশাইরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। সত্যি কথা বলতে কী, অনেক দুঃখ কষ্ট, অনেক মাথার ঘাম পায়ে ঝরানোর পর আমাদের স্কুল এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল। আমরা বিশ্বাস করি, দু-একটা ঘটনার কথা খুলে বললেই পবনপুরের বেশিরভাগ মনুষই আমাদের স্কুলের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবেন।

আর পাঁচটা স্কুলের মত, আমাদের স্কুলেও প্রতিবছর 'বার্ষিক অনুষ্ঠান' হয়। বেশ ধুমধাম করেই হয়। স্কুলের পিছনের দিকে প্যাণ্ডেল খাটানো হয়। স্টেজ তৈরি হয়। সারি দিয়ে চেয়ার পাতা হয়। বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে ভূগোল স্যার আদিত্যবাবু গলা কাঁপিয়ে

মাইকে বলতে থাকেন, নমস্কার, অদ্য বৈকাল পাঁচ ঘটিকায়...।

পরীক্ষায় যেসব ছাত্র ফার্স্ট, সেকেন্ড হয় তাদের প্রাইজ দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া নাটক, গান, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক, ম্যাজিক—এইসব হয়। সব মিলিয়ে আমাদের দারুণ মজা। সব ছাত্রই কম বেশি জড়িয়ে পড়ি। যারা প্রাইজ পাই না, নাটক, গানেও চান্স পাই না তারা সব ভলান্টিয়ার হই। বুকে নীল ব্যাজ্ আটকাই। অনুষ্ঠান শেষে ব্রাউন পেপারের ঠোঙায় একটা নিমকি, একটা অমৃতি, একটা করে দানাদার পাই। প্রতি বছরই এইসব ঠিক থাকে। শুধু গণ্ডগোল হত 'প্রধান অতিথি' নিয়ে। আসলে 'প্রধান অতিথি' করে কাকে আনা হবে, তার জন্য স্কুলে একটা কমিটি ছিল। 'প্রধান অতিথি' কমিটি। এই কমিটিতে পবনপুরের কয়েকজন বড় বড় লোক আর কয়েকজন মাস্টারমশাই ছিলেন। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে এই কমিটির মিটিং হত। সেখানে প্রচণ্ড ঝগড়া হওয়ার পর প্রধান অতিথির নাম ঠিক হত। সেই কমিটিতে একবার এমন ঝগড়া হয়েছিল যে, দু'জনকে প্রধান অতিথি করতে হয়েছিল। সেবার অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরেই পবনপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভোট ছিল। মাধব গড়গড়ি, বলাই পাল দুজনে সেই ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের কমিটিতে দলেরই সমর্থক ছিলেন। একদল বললেন, "মাধববাবুকে চাই," একদল বললেন, "বলাইবাবুকে আনতে হবে।"

অগত্যা দু'জনেই এলেন। অনুষ্ঠান শুরুতে মাধববাবু বললেন, "আমি যদি ভোটে জিতি তাহলে এই স্কুলের প্রতি ক্লাসে যাতে ২০ জন ২৫ জন করে ফার্স্ট হয় তার ব্যবস্থা করব।" অনুষ্ঠানের শেষে বলাইবাবু বললেন, "আমি যদি একবার ভোটে জিতে পারি তাহলে শুধু ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়া ছাত্র নয়, ফেল করা ছাত্ররাও যাতে প্রাইজ পায় তার ব্যবস্থা করে ছাড়ব।" এক বছর 'প্রধান অতিথি' করে নিয়ে আসা হল ব্যায়ামবীর তপেশ রঞ্জন মল্লিককে। তিনি ভাষণ দেওয়ার বদলে মঞ্চে উঠে বাইসেপ আর ট্রাইসেপের খেলা দেখালেন। পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, গলায় মালা ঝোলানো প্রধান অতিথি ব্যায়াম দেখাচ্ছেন—একটা দৃশ্য হয়েছিল বটে! গেলবারের আগেরবার কমিটির মিটিংয়ে জগদীশ নস্কর খুব কান্নাকাটি করে বললেন, "আমার মামাতো

ভাই ভুটু মল্লিককে আপনারা এবার চান্স দিন। সে বেচারি কখনও 'প্রধান অতিথি' হয়নি।" জগদীশবাবু এ অঞ্চলে বিশেষ নামকরা মানুষ। তাঁর দুটো পুকুর, তিনটে লরি আছে। সুতরাং তাঁর কথা ফেলা যায় না। কমিটির অন্যরা বললেন, "আপনার মামাতো ভাইয়ের বায়োডাটা কী? আমন্ত্রণপত্রে কী লেখা হবে?" জগদীশবাবু চোখের জল মুছে একগাল হেসে বললেন, "ভুটু রেডিওতে হারমোনিয়াম বাজায়।"

তাই হল। আর আমরা সেবছর নিমকি, দানাদারের সঙ্গে ঠোঙায় একটা করে সন্দেশ পেলাম জগদীশবাবুর আয়োজনে। তবে ব্যায়ামবীরের মত ইনিও যদি ভাষণের বদলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে শোনান এই ভয়ে স্টেজের ধারেকাছে সেবার কোনও হারমোনিয়াম রাখা হয়নি।

বিচ্ছিরি কাণ্ড হল গতবছর। 'প্রধান অতিথি' কমিটির সকলে একমত হলেন, এবার আনা হবে কবি নিমাইচাঁদ গুপ্তকে। দুজনে কলকাতায় ছুটে গিয়ে অনেক কষ্টে কবিকে রাজি করালেন। অনুষ্ঠানের দিন সকালে খুব বিরক্ত মুখে তিনি পবনপুরে এসে হাজির হলেন। অত বড় কবি বলে কথা! আমাদের সামান্য স্কুলের অনুষ্ঠানে তাঁকে ডেকে আনাটা যে খুব অন্যায় হয়েছে, সেকথা তিনি বারবার হাবেভাবে বোঝাতে লাগলেন। বিমান স্যারের বাড়িতে তাঁকে রাখা হল। সবাই তো খুব ভয়ে ভয়ে আছে। পাছে যত্নে কোনও ত্রুটি হয়। স্কুলের নাম ডুববে তাহলে। দুপুরে কবি মাছের মাথা দিয়ে ডাল, মাংস, চাটনি খেয়ে বললেন, "এবার আমি একটু চোখ বুজে কবিতা ভাবব। সেই ব্যবস্থাই হল।"

সন্ধেবেলা প্রধান অতিথিকে দেখবার জন্য আমাদের প্যান্ডেল একেবারে উপচে পড়ল। গিলে করা পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরে কবি বসে আছেন মঞ্চে। ভুরভুর করছে সেন্টের গন্ধ। এত নামকরা কাউকে পবনপুরের লোক আগে কখনও দেখেনি। সবাই কান পেতে আছে। উনি কী বলেন তা শোনার জন্য। ভাষণ দিতে উঠে কবি বললেন, "আমি আপনাদের সামনে কী বলব? আমার কথা আপনারা বুঝতে পারবেন না। তার থেকে আমার লেখা একটা কবিতা বলছি।

শুনুন। দেখুন যদি বুঝতে পারেন।"

চোখ বুজে তিনি আবৃত্তি শুরু করলেন, "আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমন পশিল প্রাণের পর—"

ক্লাস সিক্সের নন্টে বসেছিল স্টেজের সামনে মাটিতে। সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগল, "এ মা, স্যার, টুকলিফাই, টুকলিফাই। রবি ঠাকুরের কবিতা টুকলিফাই করেছে স্যার।"

সেবছরই ছিল আমাদের শেষ "প্রধান অতিথি" আনা।
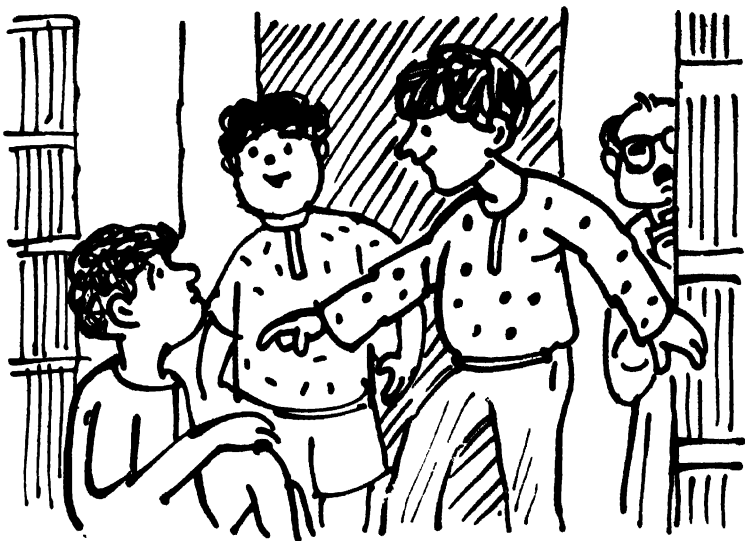
রিহার্সাল ছাড়া

সে বছর আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এক বিপত্তি ঘটেছিল। ঘটনাটা বলি—

অন্য বছরের মত সেবারও ঠিক হল যে, বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সঙ্গে আবৃত্তি, গান, হাস্যকৌতুক আর নাটক হবে। একমাস আগে নোটিস বোর্ডে ভূগোলের স্যার বিকাশবাবু আর ইংরেজির স্যার শম্ভুবাবুর সই করা নোটিস লাগিয়ে দেওয়া হল—'যারা যারা বার্ষিক অনুষ্ঠানে নাটক, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি করতে চাও তারা আমাদের কাছে নাম জমা দাও।"

প্রতি বছরের মত এবারও নাম জমা দেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এক একটা ক্লাস থেকে যে কত নাম জমা পড়ল তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

বিকাশবাবু আর শম্ভুবাবু বললেন, যত নাম জমা পড়েছে সবাইকে যদি অনুষ্ঠানে নিতে হয়, তাহলে সেদিন আমাদের নাকি পাঁচশো সাতান্নটা গান, সাতশো দশটা আবৃত্তি, বিয়াল্লিশটা নাটকের ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে তো একদিন হবে না, টানা পনেরো দিন

ধরে করতে হবে। কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়। তাই ঠিক হল পরীক্ষা হবে। সেখানে গোনাগুনতি যে ক'জন পাস করবে তারাই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে।

সেই পরীক্ষার দিনও এক এলাহি কাণ্ড হল। টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে গেল। অনেকের বাবা-মা পর্যন্ত চলে এলেন। স্কুলের সামনে ডাব বিক্রি হতে লাগল। স্কুলের বাইরে গাছের ছায়ায় মাঠের এক কোণে দেখা গেল কেউ হাত-পা নেড়ে 'সোনার তরী' আওড়াচ্ছে, কেউ বা 'অবাক জলপান'-এর পার্ট মুখস্থ করছে। ক্লাস সিক্সের প্রতুল তো কপালে দইয়ের ফোঁটা লাগিয়ে চলে এসেছে!

যাই হোক, উৎকণ্ঠা একসময় শেষ হল। পরীক্ষা হয়ে গেল। অত আবৃত্তি, গান আর নাটকের পার্ট শুনে বিকাশবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে দু'দিন ছুটি পর্যন্ত নিতে হল। তবে দু'দিন পরেই নোটিস বোর্ডে ফাইনাল তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেই ভাগ্যবানদের নিয়ে বিকাশবাবু আর শম্ভুবাবু জোরকদমে রিহার্সাল শুরু করে দিলেন। আর যারা চান্স পেল না তাদের সব ভলেন্টিয়ার করে দেওয়া হল। বলা হল, অনুষ্ঠানের দিন তোমরা তাড়াতাড়ি এসে বুকে ব্যাজ আটকে তৈরি থাকবে।

দেখতে দেখতে দিন চলে এল। আগের দিন, সব কিছু রেডি। সন্ধেবেলা স্টেজ রিহার্সাল হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে হল প্রচুর খাওয়া-দাওয়া।

এই খাওয়াই যে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবে কে বুঝেছিল?

অনুষ্ঠান শুরুর দশ মিনিট বাকি। বিকাশবাবু আর শম্ভুবাবু ছুটোছুটি করছেন। কী ব্যাপার? কেউ আসেনি। উদ্বোধনী সঙ্গীতের বিকাশ, বাবলু, অজয় আসেনি। আসেনি আবৃত্তির মলয় হলধর, সুব্রত। গানের দ্বিজু, ব্রতীশ, অমিয় নেই। নেই নাটকের তাপস, বিনয়, দেবু, সুপ্রিয়রা। কী হল! কারোর পেট ব্যথা, কারোর হজমের গণ্ডগোল, কারোর বমি, কারোর চোঁয়া ঢেকুর, কারোর মাথা ঝিমঝিম।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন বিকাশবাবু। শম্ভুবাবু কিন্তু ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের ডেকেডেকে সব কী জানি বলতে লাগলেন। ছাত্ররা জটলা করে তাঁর কথা শুনতে লাগল আর খুব মাথা নাড়তে লাগল।

আশ্চর্য ঘটনা হল ঠিক সময়তে স্টেজের পর্দা সরে গেল শম্ভুবাবুর নির্দেশে!

শুধু হল অনুষ্ঠান! কথা ছিল উদ্বোধনী সঙ্গীত হবে কোরাসে। গাইবে ক্লাস এইটের ছেলেরা। বদলে ক্লাস সিক্সের তপন একাই গাইল, 'এই লভিনু সঙ্গ তব।' তালে একটু গণ্ডগোল হল বটে কিন্তু সে কিছু নয়। এরপর আবৃত্তি। ক্লাস সেভেনের হলধর গলা কাঁপিয়ে 'আফ্রিকা' করবে বলে ঠিক ছিল। বদলে ক্লাস সেভেনেরই তমাল বলল, "শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে।' একটু ভুলে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শেষে হাততালি পেল অনেক। ঠিক এরকমভাবেই আরও বেশ কয়েকটা আবৃত্তি, গান হল। দু'জন তো দু'লাইন করে গান গেয়ে বাকিটা ভুলেই গেল। তাতে অনুষ্ঠান আরও জমে উঠল। সবথেকে বড় আশ্চর্যের ঘটনা ঘটাল ক্লাস এইটের ছেলেরা। তারা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকটাও করে ফেলল। মেকআপ ছাড়াই। বিকাশবাবু আর শম্ভুবাবু আড়াল থেকে প্রম্পট করলেন আর ওরা তা শুনে শুনে দুর্দান্ত অভিনয় করল। কখনও হয়ত জাম্বুবানের পার্ট হনুমান বলে ফেলল, কখনও হয়ত রাম পার্ট ভুলে জিভ কাটল। কিন্তু এতে মজা একটুও কমল না, উল্টে বাড়ল।

সেদিন রিহার্সাল ছাড়া অনুষ্ঠান এত হাততালি পেয়েছিল যে সেই আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল।

পানাপুকুরের রত্ন

ভূতোর লজ্জা করছে। খুবই লজ্জা করছে।

ফোঁস ফোঁস করে দম ফেলে বিশাল চেহারার ট্রেন ঢুকছে পানাপুকুর রেলস্টেশনে। ভূতো দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। দুটো হাত দিয়ে শক্ত করে হাতল ধরা। মুখে লাজুক হাসি।

পানাপুকুরের মতো অজ পাড়াগাঁয়ের রেলস্টেশনে এত বড় গাড়ি আগে কখনও দাঁড়ায়নি। সারাদিনে দুটো মাত্র লোকাল ট্রেন আসে-যায়। একটা সকালে, একটা সন্ধের পর। কর্ড লাইনে গোলমাল থাকলে সন্ধেরটা কোনও কোনওদিন বাতিল হয়ে যায়। পানাপুকুরের মানুষ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বড় বড় মেল, এক্সপ্রেস, সুপারফার্স্ট পানাপুকুরকে হরদম তাচ্ছিল্য করে চলে যায়। যাওয়ার সময় বিদ্রূপ করে হুইশল্‌ও দেয়। সেই হুইশলের আওয়াজ শোনা যায় অনেক দূর পর্যন্ত। ঠিকই করে। তাচ্ছিল্য করার জিনিসকে তাচ্ছিল্য করবে না তো কী করবে?

কিন্তু, আজ এই ট্রেন এসেছে। এর কারণ, আজ একটা বিশেষ দিন। এই ট্রেনও একটা বিশেষ ট্রেন। রেল কর্তৃপক্ষ নিজে এই ট্রেনের

ব্যবস্থা করেছেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল গাড়ির কনভয় হবে। সাতাশটা গাড়ির কনভয় ছাড়বে কলকাতা থেকে। দু-একটা বাড়তেও পারে। পরে সেই সিদ্ধান্ত বদল হল। রাস্তা মোটে ভাল নয়। দু'দিনের মধ্যে অতটা রাস্তা সারানো অসম্ভব। তার ওপর পানাপুকুর পর্যন্ত যেতে সময় নেবে অনেকটা। তাই, ট্রেনের ব্যবস্থা। শুধু ব্যবস্থা হয়নি, গোটা ট্রেনটাই সাজানো হয়েছে। গাঁদা ফুলের মালা দুলছে। বড় বড় রঙিন রাংতার বল উড়ছে।

শুধু ট্রেন নয়, পানাপুকুর স্টেশনও সাজানো হয়েছে। সরস্বতীর পুজোর মতো রঙিন কাগজের চেন, কাগজের পতাকা পতপত করে উড়ছে। আলোর স্টান্ডগুলোতে ফুলের রিং। জীর্ণ টিকিট কাউন্টারের গায়ে লাল, নীল, হলুদ কাপড়। বড় বড় কাপড়ের ব্যানার স্টেশন ভর্তি। কোনওটায় লেখা— "শ্রীমান ভূতোকে স্বাগতম।" কোনওটায় লেখা— "পানাপুকুরে প্রাণের ছেলে ভূতো। জিন্দাবাদ।" কোনওটায় লেখা— "ভূতোকে গ্রামের বড়দের আশীর্বাদ, ছোটদের ভালবাসা।" কেনটাও লেখা— "ভূতো তোমারে সেলাম।"

প্ল্যাটফর্মের এক পাশে ব্যান্ডপার্টির দল। ঝলমলে পোশাকে বুড়ো লোকগুলো গায়ের সব জোর দিয়ে স্যাক্সোফোন, ক্ল্যারিওনেট আর ড্রাম বাজাচ্ছে।

ভূতো অবাক হল। ব্যান্ডপার্টি এল কোথা থেকে! কলকাতা থেকে নাকি? পানাপুকুরে মাঠ আছে, খেত আছে, পুকুর আছে। ব্যান্ডপার্টি নেই!

ট্রেন পুরোপুরি থামার আগেই স্টেশনে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ভূতোকে দেখতে পেয়ে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ পড়িমড়ি করে গাড়ির পাশে পাশে ছুটছে। বেশ কয়েকজন আছাড় খেয়ে পড়ল। ওই তো মনাদা, সেনকাকু, বলাই... ওই তো বিশ্বম্ভর, হানিফ, কল্যাণ-মাস্টার। আরে জগাই, পটল, পল্টুও ছুটছে যে। ছুটছে আর তার দিকে হাত নাড়ছে। গাড়ি থামার তর সইছে না যেন।

ভূতো শুনতে পেল স্টেশন জুড়ে গর্জন উঠেছে—

'ওই তো ভূতো, আমাদের ভূতো।'

লজ্জায় আরও খানিকটা লাল হয়ে উঠল ভূতো। ছি ছি। কী

কাণ্ড! কোন মানে হয়? তাকে নিতে গোটা গ্রাম যে স্টেশনে ভেঙে পড়েছে!

মনে পড়ল, যাওয়ার দিনটা ছিল অন্যরকম। সন্ধেবেলার গাড়ি ছিল। সারাদিন ধরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঠিক সন্ধেতেই ঝেঁপে নামল। কাঁধে ঝুলিয়ে একাই এসেছিল ভূতো। ফুটোফাটা ছাতা খুলে কোনও লাভ না। ভিজে একসা হতে হল। নির্জন, প্রায় অন্ধকার স্টেশনে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিল ভূতো।

মনাদা ক'দিন আগেও তাকে কত ধমক-ধামক দিল।

"কাজকর্ম কিছু নেই? দিনরাত শুধু মাঠেঘাটে ছোটাছুটি করলেই হবে?" রেগে গেলে মনাদার 'ঠ'গুলো সব 'ট' হয়ে যায়। বকুনি খেয়ে ভূতো গলা নামিয়ে বলল, "একটু প্র্যাকটিস করছিলাম মনাদা।"

"প্র্যাকটিস! কীসের প্র্যাকটিস?"

"দৌড়ের প্র্যাকটিস। কদিন পরে...।"

মনাদা হুঙ্কার দিলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, "চোপ। দৌড়ের আবার প্র্যাকটিস কীসের? অ্যাঁ! কী হবে প্র্যাকটিস করে? তুমি কি ঘোড়া রেসের মাঠে কাজ পাবে?"

ভূতো আমতা আমতা করে বলে, "সে-দৌড় নয় মনাদা, এ-দৌড় হল...।"

"বাজে বোকো না ছোকরা। দৌড়ের আবার এ-দৌড়, সে-দৌড় কী হে? অ্যাঁ! যাও যাও কথা না-বাড়িয়ে বাড়ি গিয়ে চাকরির পরীক্ষার জন্য প্র্যাকটিস কর। আজকাল কত সব পরীক্ষা হয়েছে। রেল, পোস্টাপিস। বয়স বাড়ছে। এরপর পা ধরে সাধাসাধি করলেও আর কেউ সরকারি চাকরি দেবে?"

সেই মনাদাও ট্রেনের পাশে আজ দৌড়োচ্ছে!

সেনকাকু হোঁচটও খেলেন। ভূতো হাত বাড়িয়ে কিছু একটা বলতে গেল, স্টেশন ভরা মানুষের উচ্ছ্বাস আর গর্জনে কিছুই শোনা গেল না। সেনকাকু পায়ের চটি ফেলেই ছুটছেন। খুবই লজ্জার বিষয় এটা। গুরুজন মানুষ, তিনি কেন খালি পায়ে ছুটবেন? এটা ঠিক নয়। মানুষটা আবার বেদম রাগীও। তবে, মনাদার মতো ভূতোকে অমন ধমক-ধামক দেননি কখনও। যেটুকু রাগারাগি করার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের

ঢঙেই করেছেন।

মাস তিনেক আগে সেনকাকার সঙ্গে ভূতোর দেখা হল বাজারে। ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, "এই যে ছেলে, শুনছি তুমি নাকি ছোটাছুটি নিয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? তোমার কাকা সেদিন বলছিল।"

"খেলাধুলো! ছোটাছুটির আবার খেলাধুলো আছে নাকি! সে তো শুনেছি ক্যাঙারুরা করে। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারু। তুমি তো বাছা ক্যাঙারু নয়, পানাপুকুরও অস্ট্রেলিয়া বলে মনে হচ্ছে না।"

বাজার ভর্তি লোকের সামনে এই অপমান গায়ে লাগার মতো। ভূতো অবশ্য গায়ে নিল না। বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ।

সেনকাকা হেসে বললেন, "না না চিন্তা নেই। ছোটাছুটির খেলা চালিয়ে যাও ভূতো। জোরকদমে চালিয়ে যাও। তবে, কাঁধে একটা ভারী ব্যাগ আর হাতে একটা লাঠি নিও।"

"লাঠি!"

"অবশ্যই লাঠি। শুনেছি আমাদের দেশে এখনও কোথাও কোথাও ডাকহরকরা সিস্টেম চালু আছে। মনে হচ্ছে সেই কাজ তোমার কপালে ঝুলছে বাছা। রানার চলেছে তাই ঝুম্ ঝুম্, ঘণ্টা বাজছে রাতে...হা হা। নিজের জীবনে তো ইতিমধ্যেই ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছ দেখছি।"

বেচারি মানুষটার এখন কী বিচ্ছিরি অবস্থা! খালি পায়ে ছুটছেন। কল্যাণমাস্টারই বা কম কীসের? তবে, অল্পবয়সীদের সঙ্গে তিনি ছোটাছুটিতে পাল্লা দিতে পারছেন না। সম্ভবত সেই কারণে ব্যান্ডপার্টি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। দু'হাত মাথার ওপর তুলে, নামিয়ে বাজনদারদের হুকুম দিচ্ছেন। সেই মতো গলার শিরা ফুলিয়ে, হাতের পেশি নাড়িয়ে তারা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করছে। ভূতো একটু মজাই পেল। কল্যাণ-মাস্টারের সঙ্গে গান-বাজনার কোনও সম্পর্ক নেই। পানাপুকুরের বয়েজ স্কুলের তিনি অঙ্কের শিক্ষক। যেমন-তেমন শিক্ষক নয়। কড়া ধরনের শিক্ষক। ওঠবোস আর নীলডাউনে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। পাটীগণিতে গোলমাল করার জন্য ছেলেবেলায় ভূতো এই মাস্টারের কাছে কতবার যে কানমলা খেয়েছে তার ঠিক নেই।

অঙ্ক ভুল হলে কল্যাণ-মাস্টার সাধু-চলিত গুলিয়ে ফেলতেন।

"গর্দভ ভূতো তোমার জীবনে কিছুই হইবে না। পানাপুকুরের ঘাটে তুমি কচুরি পানার ন্যায় পড়িয়া থাকিবে।"

আজ যে-মানুষটা ভূতোর কারণে ব্যান্ডপার্টির বাজনা নিয়ে চরম মাতামাতি করছেন, সেই মানুষটাই এক বার ক্লাস নাইনে 'ব্যাঙ কটকটি' বাজানোর অপরাধে ভূতোকে রোদে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন পাক্কা কুড়ি মিনিট।

ভূতো মুখ লুকিয়ে হাসল।

কিছু বোঝার আগেই চলন্ত ট্রেনে গাদাখানেক লোক লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ল। গলায় মণখানেক ওজনের গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিল চটপট। ভূতোর দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ভিড়ের মধ্যে সবাইকে চিনতেও পারছে না। তবে, বলাইকে দেখতে পেল। ঘোষ পাড়ার গুণ্ডা বলাই। গুণ্ডা বলাই তার মুখে খানিকটা সন্দেশ গুঁজে দিতে দিতে বলল, "ভাই ভূতো আমার হাতেই আজ তোর প্রথম মিষ্টিমুখ হোক। কিছুতেই না শুনব না, মুখ খোল, মুখ খোল ভাই আমার।"

নিমেষে পুরনো দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল ভূতোর।

তখন প্রতি বছর শীতের সময় গাঁয়ে মেলা বসত। মেলার মাঠেই খেলাধুলোর আসর। বস্তারেস, দড়িটানাটানি, যেমন-খুশি-সাজো। সেবছর ছিল ম্যারাথন দৌড়ের কম্পিটিশন। গোটা মাঠ ঘিরে দশ পাক দৌড়। দৌড় শেষ করলে একশো এক টাকা প্রাইজ। দশ পাক দৌড় ভূতোর কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। দশ কেন, ইচ্ছে করলে পঁচিশ পাকও মেরে দিতে পারে সে। নিশ্চিন্ত মনে দৌড় শুরু করল। কিন্তু, তিন পাকের মাথায় বিশাল চেহারার বলাই তাকে ল্যাং মেরে ছিটকে ফেলল বিচ্ছিরিভাবে। মুখ থুবড়ে পড়ল ভূতো। থুতনি ফেটে রক্তারক্তি। দৌড় শেষে ভূতো বলল, 'এটা কী হল বলাই?'

গুণ্ডা বলাই চোখ পাকিয়ে বলল, "যা হল ঠিক হল। এর পর কোনওদিন যদি আমার সঙ্গে কম্পিটিশনে নেমেছিস তা হলে দাঁতগুলোও ভেঙে দেব। তার পর জুতোর মালা পরিয়ে গাঁয়ে ঘোরাব।"

সেই বলাই তাকে আজ ফুলের মালা পরাচ্ছে!

উঁচু গাড়ি বলে প্ল্যাটফর্ম অনেকটা নিচু। সাবধানে নামতে হয়। তবে, ভূতোকে সাবধানে নামতে হল না। অনেকে মিলে তাকে কোলে লুফে নিল। তারপর মাথার ওপর তুলে শুরু হল লাফালাফি।

ভূতো তো ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। কী বিপদ রে বাবা! পড়ে যাবে যে। বাড়ির কেউ আসেনি? এলেও এই ভিড়ে খুঁজে বের করা অসম্ভব। শুধু মানুষের মাথা আর মাথা।

ওই তো ছোটকা? ওই তো গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। ভূতো গলা তুলে ডাকল। হইচইতে সেই ডাক মিলিয়ে গেল। ছোটকার টাকাটা আজই শোধ করে দিতে হবে। নিজে করার দরকার নেই। কাকিমাকে দিয়ে করাতে হবে। "এই নাও কাকিমা ছোটকার টাকাটা রাখ।"

"কোন টাকা?"

"বাঃ, সেবার একটা স্টপ ওয়াচ কেনার জন্য নিয়েছিলাম, মনে নেই?"

কাকিমা বলবে, "থাক না, এত তাড়া কীসের।"

"না কাকিমা তুমি আজই দিয়ে দেবে। অনেক কষ্ট করে ছোটকা জোগাড় করেছিল।"

ওই সামান্য ক'টা টাকা জোগাড় করতে মোটেও কষ্ট করতে হয়নি ছোটকাকে। কিন্তু, ভাইপোকে দেওয়ার সময় অনেক কষ্ট হয়েছিল। কাকিমাকে কথাও শুনিয়েছিল এক গাদা।

"অনেক হয়েছে ওই ছেলেকে এবার থামাও। এইভাবে টাকা খরচ করার মতো অবস্থা তার নয়। মা-বাবা মরা ছেলে। কাকা-কাকিমার ঘাড়ে বসে খাচ্ছে। এবার নিজের হাল নিজেকে ধরতে বল।"

কাকিমা মুখ নামিয়ে বলেছিল, "বলি তো, শোনে না। ছোট থেকেই ছেলেটার খেলাধুলোর শখ।"

ছোটকা গলা তুলে বলেছিল, "শখ! এটা কোনও শখ হল? তা-ও ক্রিকেট, ফুটবল হলে বুঝতাম। ও-সবে চাকরি-বাকরির সুযোগও থাকে। দৌড় একটা খেলাধুলো হল! ব্যাঙের মাথা হল। ফ্রগস্ হেড। কী হবে দৌড়ে? দৌড়তে যদি হয় কেরিয়ারের পেছনে দৌড়তে বল।"

কাকিমা বলল, "এতবড় ছেলে যদি নিজের ভালমন্দ না-

বোঝে..।”

“না-বুঝলে বকে বোঝাতে হবে। দেখ, কথাটা কঠিন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ভূতো যা শুরু করেছে তাতে কঠিন কথা শোনানোর সময় এসেছে। অনেকদিন হল আমি ওকে টানছি সেই দাদা মারা যাওয়ার পর থেকেই। তার পর বউদিও চলে গেল। খাওয়া, পরা, লেখাপড়া সবই তো করালাম। কিন্তু, আর কতদিন? আর যখন-তখন টাকা-পয়সা চাইতে বারণ কর।”

মাথা থেকে নামানো হয়েছে ভূতোকে। হাতে পেন, নোটবই, ক্যামেরা বাগিয়ে চারদিক থেকে ছুটে এল সাংবাদিক আর ফোটোগ্রাফাররা। এরা সব কোথা থেকে এল! নিশ্চয় কলকাতা থেকে এই ট্রেনেই এসেছে। পানাপুকুরের মানুষ অনেক কিছু দেখেনি। অভাব, অনটন, গা-ছমছমে অন্ধকার রাত। কিন্তু, সাংবাদিক বিশেষ দেখেনি। শুধু ভোটের সময় কালেভদ্রে এক-আধজন আসে। বাজারের কাছে চায়ের দোকানে বসে চা খায়, সিগারেট ফোঁকে। ফের গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যায়। তা-ও প্রতি ভোটে আসে না। আজ একেবারে প্ল্যাটফর্ম ছেয়ে গেছে। হাতে টেপ রেকর্ডার, টিভির বুম। সবাইকে ঠেলে, কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে তারা ভূতোর জামা-প্যান্ট ধরে ঝুলোঝুলি শুরু করল।

“স্যার নিজের গ্রামে এসে আপনার কেমন লাগছে?’

“আপনার এই সাফল্যের পেছন পানাপুকুরের অবদান কতখানি?”

“ভূতোবাবু, গ্রামের কোন জায়গা আপনার সব থেকে প্রিয়?”

“ভূতো, তুমি নিজের গ্রামের জন্য কি কিছু করার কথা ভাবছ?”

“তুমি গাঁয়ের কোন মানুষটাকে সব থেকে বেশি ভালবাস?”

“পানাপুকুরের জন্য তুমি কি গর্বিত?”

“গ্রামের কোন খাবার তোমার প্রিয়?”

ভূতো কোনও কথারই উত্তর দিতে পারল না। হানিফ, পল্টু, বিমলরা তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। স্টেশনের বাইরে ছোট একফালি মঞ্চ। মঞ্চের পেছনে কাপড়ে বড় বড় করে লেখা—

“পানাপুকুরের রত্ন শ্রীমান ভূতোর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।”

সবাই মিলে ঠেলে ভূতোকে মঞ্চে তুলল। মঞ্চে ওঠবার সময়

ভূতো একঝলক দেখতে পেল মেয়েরা লাল পাড় শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে সারি দিয়ে। তারা শাঁখ বাজাচ্ছে। ভূতোর গায়ে ছুঁড়ছে ফুলের পাপড়ি। গাল দুটো নিজের অজান্তেই লাল হয়ে গেল ভূতোর। লাল হয়ে যাওয়ারই কথা। এই ফুটফুটে মেয়েরা সব পানাপুকুর গার্লস হাইস্কুলের মেয়ে।

মঞ্চে ভূতোর চেয়ারটা যেন বিয়েবাড়ির বরের চেয়ার। সিংহাসনের মতো। সেখানে বসতে ভূতোর যে কী অস্বস্তি হল তা বলার নয়। বাপ রে, সামনে কত মানুষ! গোটা পানাপুকুরের সব মানুষ কি আজ এখানে? তারা লাফাচ্ছে, হাসছে। হাত তুলে নাড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে—'ভূতো, ভূতো, ভূতো।'

মাইকে গান হচ্ছে। আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার...।

মাঝপথে গান থামিয়ে রেখে কে যেন জলদগম্ভীর গলায় ঘোষণা করে উঠল, "এবারে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন পানাপুকুরের সবার প্রিয়, সবার আপন, আমাদের নেতা শ্রীশ্রী কালীপদ সামন্ত।"

ভূতো সামান্য চমকে উঠল। সেই কালীপদ! সবাই বলেছিল, "একবার কালীপদ সামন্তর কাছে যা না। খেলাধুলো করলে তো কতরকম চাকরি-বাকরি পাওয়া যায়। যা না একবার চেষ্টা করে দেখ।"

ভূতো আড়চোখ তাকাল। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পানাপুকুরের নেতা। পাটভাঙা ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে সৌম্যদর্শন মানুষটাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। সুন্দর মানুষকে সুন্দরই তো দেখাবে।

"আজ আমাদের আনন্দের দিন। আজ আমাদের গর্বের দিন। শ্রীমান ভূতো আজ আমাদের পানাপুকুরের নাম গোটা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে। তাকে আমার স্নেহ, ভালোবাসা, আশীর্বাদ।"

এক রবিবারের সকালে কালীপদ সামন্তর কাছে ভূতো গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না। সংসারের অভাব তখন ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে ছোটকা হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। ঘরে দশটা টাকাও থাকে কি না সন্দেহ। নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো অবস্থা। এক সকালে ভয়ে ভয়ে গিয়ে হাজির হল সে।

"কী খেলাধুলো করা হয় বাছার?"

'দৌড়।' ঢোঁক গিলে বলল ভূতো।

নাক-মুখ কুঁচকে কালীপদ সামন্ত বললেন, "কী? কী বললে?"

দৌড়ই স্যার। রেস।

কালীপদ সামন্তর তখন সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে শম্ভু, মদন, বেচা, বিমলবাবু, সুধীর পালিত। তাদের দিকে তাকিয়ে কালীপদ ভুরু তুলে বললেন, "ছোকরা কী বলে শুনলি? শুনলি তোরা? কাছে গেছে? বলে কিনা দৌড় দৌড় খেলি! হা হা।"

সবাই ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল। লজ্জায়, দুঃখে মাথা নামাল ভূতো।

"বাছা, শুধু দৌড় দেখিয়ে চাকরি চাইতে এসেছ! তোমার জন্য রেকমেন্ডশনের চিঠিতে কী লিখব বাপু? এই ছেলেটি খুব জোড় দৌড়তে পারে, দয়া করে একে একটি কাজকর্মের ব্যবস্থা করে দিন। তবে, এর জন্য অফিসে কোনও চেয়ার-টেবিলের প্রয়োজন নেই পানাপুকুরের ভূতোবাবু ছুটে ছুটে ফাইল দেখবেন, ছুটে ছুটে চিঠি লিখবেন, ছুটে ছুটে হিসেব কষবেন। ইনি হবেন আপনার অফিসে একজন ছুটন্ত কর্মী। হা হা।"

দম বন্ধ করে হাসতে লাগলেন নেতা। বাকিরা গড়িয়ে পড়ল। শম্ভু আর বেচা তো চিত হয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে হাসতে লাগল।

সেদিন মুখ কালো করে কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছিল ভূতো।

মাইকে গদগদ গলায় কালীপদ সামন্ত বলে চলেছেন, "এই ছেলেকে আমি অনেকদিন আগেই চিনেছিলাম। অনেক আগেই বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম ভূতোর মধ্যে ক্ষমতা আছে। দৌড়তে দৌড়তে সে একদিন পৌঁছে যাবে অনেকদূর। সবাইকে ছাড়িয়ে, সবাইকে হারিয়ে লক্ষ্য ছোঁবে। আজ তাই আমি পঁচিশ হাজার টাকার একটা চেক প্রদান করব। অ্যাই ভূতো মুখ নামিয়ে বসে আছিস কেন? মুখ তোল, তোল মুখ। সবাই তোর উজ্জ্বল খুশি মুখ দেখতে চায় রে বেটা।"

ভূতো মুখ তুলল। জনসমুদ্র থেকে আওয়াজ উঠল আবার।

"ভূতো, ভূতো, ভূতো..."

সবাই ভাবছে ভূতো তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তা কিন্তু মোটেও না, ভিড়ের মাঝে ভূতো অন্য একটা মানুষকে খুঁজছে। মৃত

মানুষ। এই মানুষটি বছরের পর বছর তাকে কাকভোরে ঘুম থেকে তুলছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভূতোর গলায় বলছে, "নে এবার ওঠ, ওঠ ভূতো।' ভূতো পাশ ফিরে বলত, 'আঃ, আর একটু ঘুমোই, আর একটু পরে উঠব।"

"না, আর একটু পরে না। এখনই উঠে পড় রোদ উঠে গেলে আর দৌড় পারবি না সোনা।"

"প্লিজ, আর দশ মিনিট ঘুমোই।"

"না, এক মিনিটও নয়। তোকে কত প্র্যাকটিস করতে হবে না? তুই নিজে তো বলেছিলি। বলিসনি? লক্ষ্মী বাছা আমার। গরিবের ঘরে দৌড় চাট্টিখানি জিনিস?"

আজ ভূতো তার সেই মৃত মাকে খুঁজছে।

বক্সার মুক্তো

জিতেও মুক্তো অনেক রাত পর্যন্ত কাঁদল।

ঠিক কান্না নয়, ফোঁপানির মতো। আমি চাপা গলায় বললাম, 'অ্যাই মুক্তো, মুক্তো চুপ কর। চুপ কর বলছি। তোর মা কিন্তু শুনতে পেলে ঘুম থেকে উঠে এসে আবার মারবে।'

মুক্তো একটুখানি চুপ করে রইল। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না। ফোঁপাতে লাগল। একঘেয়ে, একটানা সেই ফোঁপানি শুনতে শুনতে একটা সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, চোখ খুলে দেখি সকাল। মাথার পাশ থেকে সাঁই সাঁই করে গাড়ি ছুটছে। রোজ যেমন ছোটে। মুখ ঘুরিয়ে দেখি ভুজিয়া, পাতলুনরা কেউ নেই। ফুটপাথ ফাঁকা। শুধুও পাশে গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আছে মুক্তো। পার্কের রেলিঙের দিকে মাথা করে। মেয়েটা নিশ্চয় অনেক রাত পর্যন্ত কেঁদেছে। গায়ের কাঁথাটা টেনে দিতে গিয়ে দেখি, তখনও ফোঁপাচ্ছে। মেয়েগুলোর এই এক দোষ। এরা কান্না থামালেও ফোঁপানি থামাতে পারে না। আমি ফিরে এসে বিছানা গোটাতে লাগলাম। ফুটপাথের বিছানার মজা হল, পাততে গোটাতে একদম সময় লাগে না।

মুক্তোর কান্নাকাটির কারণ কালকের ঘটনা।

কাল রাতে পার্কে আমি, ভুজিয়া, পাতলুন আর মুক্তো মারপিট মারপিট খেলছিলাম। এটা আমাদের প্রিয় খেলা। সুবিধের কথা হল, এই খেলাতে বল-ব্যাট লাগে না। খরচ নেই। দিনে-রাতে যে কোনও সময় খেলা যায়। এই কারণেই আমাদের প্রিয়।

কালকের মারপিট খেলাটা ছিল একটু অন্যরকম। খেলা হয়েছে তিন কায়দায়। শুয়ে, বসে এবং ছুটে ছুটে। আমি ছুটে খেলায় খুব ওস্তাদ। তবে সব ধরনের মারপিটে আসল ওস্তাদ হল আমাদের মুক্তো। ও জিতবেই। কালও জিতেছে। মুক্তোর বয়স মোটে সাত। রোগা, পিংলে, হাড় জিরজিরে চেহারা। মাথায় গাদাখানেক জট পাকানো চুলের জন্য আরও রোগা দেখায় মেয়েটাকে। কিন্তু তা হলে কী হবে, লড়তে পারে সাঙ্ঘাতিক! ওই চেহারাতেই অনেক জোর। কোথা থেকে যে পায়? দু'হাতে মুঠি পাকিয়ে যখন ঘুষি চালায়, তখন আমরা ছুটে পালাই। পালানো ছাড়া উপায় থাকে না কোনও। ঘুষি ছাড়া মারপিটের আরও অনেক কায়দা জানে মুক্তো। চুল খামচানো, চিমটি, কাতুকুতু। সেগুলো ও অবশ্য মারপিট খেলায় কাজে লাগাতে চায় না। জাপটে বা চেপে ধরলে তবেই খামচি মারে। মুক্তোর সবথেকে পছন্দ ঘুষি। রোগা হাত ছুঁড়বে সাঁই সাঁই করে। ওপরে, নিচে, দু'পাশে। মাথা নামিয়ে জাপটে ধরতে গেলে খামচি দেবে কাঁধে। মুখে বলবে, 'ধুয়ো, হেরো। ঘুষিতে পারে না, তাই ধরতে আসে। সাহস থাকলে আয় না দেখি।' বলে ঘুষি দেখায়। কী আর করা? লজ্জায় আমরাও ঘুষি বাগাই। পুঁচকে মেয়েটা এ পাশে ও পাশে, ধাই ধুই করে ছুট লাগায়। খেলায় জিতে যায়। আমরা, ছেলেরা হেরে ভূত হয়ে যাই।

সেদিন পাতলুন বলল, 'দেখবি মুক্তো বড় হয়ে ঘুষিওয়ালি হবে।'

ভুজিয়া বলল, 'ঘুষিওয়ালি। সেটা আবার কী?'

আমি বললাম, 'তুই একটা গাধা। এগারো বছর বয়স হয়ে গেল এটা বুঝিস না? ঢিসুম ঢিসুম।'

আমি ডান হাতটা মুঠো করে ভুজিয়ার নাকের কাছে নিয়ে ঘুষি মারবার ভান করলাম।

ভুজিয়া রেগে বলল, 'বেশি পণ্ডিত। তুই কোথা থেকে জানলি?'

আমি বললাম, 'সে আছে।'

পাতলুন, বলল, 'কে, তোর নন্দদা?'

আমি মুখ ভেংচে বললাম, 'জানি না। তোর কী .

তবে যতই মুখ ভেংচাই না কেন, কথাটা ঠিক বলেছে পাতলুন। জানাজানির কিছু হলে নন্দদাই আমার ভরসা। নন্দদার কলেজ টাইমে আমি মাঝেমধ্যে গলির মুখে দাঁড়াই। নন্দদা এলে সঙ্গে সঙ্গে যাই। একেবারে সেই বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত।

প্রথম দিন মজার ঘটনা হয়েছিল। গলির মোড় থেকে আমি তো নন্দদার পিছন পিছন যাচ্ছি। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে। ভয় অন্য কোনও কারণে নয়, ময়লা ছেঁড়া জামা পরে আছি বলে ভয়। এরকম পোশাকের কেউ কাছাকাছি থাকলে সবাই ধমক লাগায়। দেখছিলাম এই মানুষটাও দেয় কিনা। এটাও আমার একটা খেলা। বকুনি খাওয়া বকুনি খাওয়া খেলা। একা একা খেলি। 'পরিষ্কার জামা, চকচকে জুতো' পরা কাউকে দেখলে পিছন পিছন যাই। 'পরিষ্কার জামা, চকচকে জুতো' বকুনি দিলে হাসতে হাসতে ছুটে পালাই। সেদিনও এরকম একজনের পিছু পিছু যাচ্ছিলাম। সেই মানুষটাই নন্দদা। নন্দদা হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'কী রে ছেলে, পয়সা চাই?' আমি মাথা নাড়লাম। নন্দদা তখন বলল, 'টিফিন খাবি?' আমি তখন জোরে জোরে মাথা নাড়লাম। নন্দদা এবার চোখ পাকিয়ে বলল, 'তা হলে? অন্য মতলব নেই তো?' আমি মিনমিন করে বললম, 'না, এমনি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

ব্যস, সেই থেকে ভাব। ইচ্ছে হলেই সঙ্গে সঙ্গে যাই। এটা-সেটা কথা বলি। নন্দদা মোটে রাগ করে না। যা জানতে চাই বলে দেয়। হয় তখনই, নয়ত পরে জেনে নিয়ে বলে। নন্দদা আমাকে ওদের বাড়িতে যেতেও বলে। আমার সাহস হয় না। ফুটপাথের ছেলেরা কারও বাড়ি যায় না।

ভুজিয়া বলল, 'দূর, মেয়েরা কখনও ঘুষি মারতে পারে?'

আমি বললাম, 'কেন? আমাদের সঙ্গে মারপিটের সময় তো পারে। ওইটুকু মেয়ে তোকে কম ধোলাই দিয়েছে? বল তুই। সত্যি কথা বল।'

ভুজিয়া বলল, 'আচ্ছা, তাই না হয় হল। এবার তুই একটা মেয়ে ঘুষিওলার নাম বল তো দেখি।'

আমি চুপ করে গেলাম। সত্যি তো। আমি তো কোনও মেয়ে ঘুষিওলার নাম জানি না। মেয়ে ঘুষিওলা আবার হয় নাকি? আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম, 'অ্যাই ভুজিয়া, ঘুড়ি ওড়াবি?'

'ঘুড়ি কোথায় পাব। ধরেছিস?'

'না, ধরব। ধরে ওড়াব। চল ফড়েপুকুরে ঘুড়ি ধরতে যাই।'

পাতলুন বলল, 'তোরা যা, আমি যাব না।'

আমি হেসে বললাম, 'কেন, যাবি না কেন? তোর কি স্কুলে পরীক্ষা?'

কথাটা বলেই আমরা তিনজনে খুব জোরে হেসে উঠলাম। হাসবই তো। আমাদের তো স্কুলই নেই। স্কুল থাকলে তো পরীক্ষা। হি হি।

যাই হোক, এবার মুক্তোর কান্নার ব্যাপারটা বলি।

আমাদের সঙ্গে মারপিট খেলায় যতই জিতুক না কেন মুক্তো, ওর প্রাইজ একটাই। মায়ের কিল। একটা-দুটো কিল নয়, অনেকগুলো কিল। কিলের সঙ্গে মাথার চুল ধরে ঝাঁকানি। মুক্তোর মা খুব ভাল চুল ঝাঁকানি দিতে পারে। আমার মনে হয় ফুটপাথে সবার মধ্যে এক নম্বর। খেলায় ঘুষি মেরে ধরা পড়লেই মুক্তোর চুল ধরে বলে, 'বল, বল আর করবি? আর করবি বল?'

মুক্তো কাতরে ওঠে। বলে 'করব না মা, আর কোনওদিন করব না।'

'ছি ছি। ছেলেদের মতো ঘুষোঘুষি! এ আবার কী? অ্যাঁ, এতদিন বারণ করেছি, কথা কানে যায় না? আজ তোর পিঠ ভাঙব। দেখবি ঘুষি কাকে বলে।'

মুক্তো আরও জোরে কাতরায়। কিলের দাপটে পিঠ বেঁকে যায় তার। কঁকিয়ে ওঠে।

'আর ঘুষি মারব না মা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও তোমার পায়ে পড়ি।'

মুক্তোর মা ছাড়ে না। বলে, 'বলেছি না, মেয়ে হয়েছিস, মেয়েদের মতো থাকবি, মেয়েদের সঙ্গে খেলবি। বলিনি? বল বলেছি কিনা?'

মুক্তো কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'বলেছ মা, অনেকবার বলেছ। হাজারবার বলেছ।'

'তা হলে? এ কেমন জিনিস? অ্যাঁ! ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে যাওয়া! ছি ছি।'

'আর খেলব না মা। আর কখনও খেলব না।'

খেলব না বলার পরও মুক্তোর মা মুক্তোকে ছাড়ে না। আরও কয়েক ঘা মারে। কাল রাতেও মেরেছে। এটা প্রায়ই হয়।

মুক্তোর ঘুষির লড়াই ওর মায়ের চোখে পড়লেই হল। মুক্তোটাও তেমনি। খেলার সময় হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে এমন করবে যে ওর মার দূর থেকে ঠিক নজরে পড়ে। আবার ঘুষি! চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যায় ফুটপাথ বাড়িতে।

আমরা মুক্তোকে অনেক বারণ করি। আমি বলেছি, 'তুই আমাদের সঙ্গে আর আসিস না মুক্তো।'

ভুজিয়া শান্ত গলায় বলে, 'তোর তো অনেক খেলা আছে। যা না, ও তো রাস্তার ওপাশে চুমকি, ঝুমা, টুসিরা দাগ কেটে খেলছে। এক্কাদোক্কা না কী যেন। ওখানে ভাগ।'

মুক্তো জিভ দেখিয়ে বলে, তুই যা। ছ্যা, ওটা আবার খেলা নাকি।'

আমি শান্ত করার জন্য বললাম, 'তা হলে পার্কে ঢুকে দোলনা চড় গে। স্কিপিং করতে পারিস? করবি? আমারটা দেব?'

মুক্তো আরও তেজ দেখায়। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, 'বয়ে গেছে তোরটা নিতে। আমার নিজের দড়ি আছে। আমার ওসব খেলা ভাল লাগে না।'

ভুজিয়া রেগে গিয়ে বলে, 'তা হলে কী ভাল লাগে? কোন খেলা?' মুক্তো ছোট ছোট দাঁত বের করে হাসে। মাথা ঝাঁকিয়ে দু'হাত মুঠো পাকিয়ে বলে, 'ঘুষি। এমন মারব তোর মাথা বোঁ করে ঘুরবে। হি হি।' কথা বলে সে নিজেই এক চক্কর মারে আনন্দে। লড়াইয়ের আনন্দে চোখ-মুখ যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে তার! মাথা ঝাঁকানোর সময়

কানের দুল দুটো দুলে ওঠে। কদিন হল মুক্তোর মা মেয়ের কান বিঁধিয়েছে। কোথা থেকে দুটো চকচকে রিং এনে পরিয়ে দিয়েছে কানে। বেশ লাগে। কালো মুখে একটুখানি চকচকানি।

মুশকিল হল আমরা এত বারণ করার পরও মুক্তো আমাদের ছেড়ে যায় না। মায়ের হাতে মার খেয়েও শিক্ষা হয় না তার। আবার এই কাজ করে। ঘুষি তাকে টানে। সেই টানে মারপিট খেলায় মেতে ওঠে ফের। ওইটুকু চেহারায় নেচে কুঁদে হাত ছোঁড়ে এমনভাবে যেন সত্যি সত্যি বিরাট ঘুষিওয়ালি এসেছে একটা। আমাদের ফুটপাথের লড়াইবাজ! খুঁটে খাওয়া আধপেটায় কোথা থেকে যে এত শক্তি পায়!

নন্দদাকে ঘুষিওয়ালির কথা বলতে বলল, 'ঘুষিওয়ালি! সেটা আবার কী? মেয়ে বক্সারের কথা বলছিস?'

আমি মাথা নাড়লাম।

নন্দদা হেসে বলল, 'ওমা, কেন থাকবে না? অনেক আছে। কালই তোকে ইন্টারনেট ঘেঁটে বলে দেব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী নেট!'

নন্দদা হেসে বলল, 'কম্পিউটার। ওই যে দোকানে দেখিস না? আচ্ছা, বাড়িতে আসিস, কম্পিউটার দেখাব। ও, তুই তো আবার বাড়িতে আসতে ভয় পাস। ঠিক আছে আমি গিয়ে একদিন নিয়ে আসব।'

আমি বললাম, 'নন্দদা, মেয়েরা ঘুষোঘুষি করে কেন? মেয়েদের কি মারপিট মানায়? ওরা পুতুল খেলবে। তাই না?'

নন্দদা আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'দূর বোকা, বক্সিং মানে কি মারপিট? বক্সিং একটা স্পোর্টস। খেলা। লড়াইয়ের খেলা। খেলায় আবার ছেলেমেয়ে কী? আজকাল মেয়েদের ক্রিকেট, ফুটবল সবই তো হচ্ছে। মহাকাশেও মেয়েরা যাচ্ছে। সেটাও খেলা। অ্যাডভেঞ্চারের মজায় বিজ্ঞান নিয়ে সিরিয়াস খেলা।'

পুরোটা বুঝতে না পারলেও, নন্দদার কথা আমার খুব ভাল লাগল।

উস্, মুক্তোর মা শুনলে আরও ভাল হত। বুঝতে পারত, তার মেয়ে শুধু মারপিট করে না। এটা একটা খেলা। ভেবেছিলাম মেয়ে

ঘুষিওয়ালাদের নাম জানলে পাতলুন আর ভুজিয়াকে বলব। এখন মনে হচ্ছে মুক্তোর মাকেও বলা দরকার। আমাকে ধমক দেবে না তো? মনে হচ্ছে দেবে। যা রাগী। আচ্ছা, আমায় যদি জিগ্যেস করে তোর কী রে? তুই কি চাস মুক্তো মারকুটে হোক? সত্যি তো। কী বলব তখন? আমি কী চাই? আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয়? নন্দদা বাসে উঠে যেতেই আমি পাতলুন আর ভুজিয়ার খোঁজে ছুটলাম। এই সময়টা ওরা গুলি খেলে। পরদিন নন্দদার সঙ্গে যখন দেখা করলাম তখন আমার সঙ্গে পাতলুন, ভুজিয়া দুজনেই আছে। মুক্তোও আসতে চেয়েছিল।

আমি বললাম, 'একটা চড় খাবি। এটা ছেলেদের ব্যাপার।'

নন্দদা আমাদের দেখে হেসে বলল, 'ওরে বাবা একেবারে ব্যাটেলিয়ান নিয়ে এসে গেছিস! ব্যাপারটা কী বলত?'

আমি বললাম, 'তুমি নামগুলো এনেছ? ওই যে মেয়েদের? যারা ঘুষি মারে।'

পকেট থেকে কাগজ বের করে বলল, 'বেশি বলব না। মাত্র পাঁচটা বলছি। আছে আরও অনেক। তবে অত খটমটে নাম শুনে ঘাবড়ে যাবি।'

আমি বললাম, 'তাই বল।'

'ক্রিস্টি মার্টিন, ডেলিয়া গঞ্জালেস, মিয়া সেন্ট জন, লায়লা আলি আর ডেইড্রে গগার্টি। এই হল দুনিয়া কাঁপানো পাঁচ মেয়ে বক্সার। তোদের কথায় ঘুষিওয়ালি।'

ভুজিয়া বলল, 'ওরে বাবা!'

নন্দদা হেসে বলল, 'আগেই বলেছিলাম না? খটমটে লাগবে। মেয়ে হলে কী হবে এরা কিন্তু সব পৃথিবীর নাম করা বক্সার। লায়লা আলি তো মহম্মদ আলির মেয়ে।'

পাতলুন বলল, 'মহম্মদ আলি কে?'

'তিনিও একজন বিরাট বক্সার। তাঁর মেয়ে ঘুষির লড়াইতে যে কতজনকে চিৎপটাং করেছে ভাবতে পারবি না। আর কয়েকজন মেয়ে বক্সারের নাম শুনবি নাকি?'

পাতলুন তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, দরকার নেই, এতেই হবে।'

নন্দদা বলল, 'তাও শুনে রাখ। সুমিয়া আনানি, ক্যারেন বিল,

বেকি গার্সিয়া। আর চাই?'

আমাদের দারুণ লাগছে। এত মেয়ে লড়াই করে! বাপ্‌রে। আমি বললাম, 'এতেই হবে। নন্দদা, ঘুষি খেলায় টাকা-পয়সা হয়?'

'টাকা-পয়সা মানে! বলিস কী? একেবারে কাঁড়ি কাঁড়ি পুরস্কার।'

আমি বললাম, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে নন্দদা।'

'চটপট বলে ফেল। আমার কিন্তু কলেজে দেরি হয়ে যাবে। অনেক বকিয়েছিস তোরা।'

ভুজিয়া বলল, 'আমাদের মুক্তো দারুণ ঘুষি মারে। ওর যদি একটা কিছু করা যেন...।'

নন্দদা ভুরু কুঁচকে বলল, 'মুক্তো! মুক্তোটা আবার কে? ঘুষি মারে মানে?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'মুক্তো আমাদের ফুটপাথে থাকে। ছোট মেয়ে। কিন্তু ছোট হলে কী হবে মেয়েটা ঘুষিতে খুব ওস্তাদ। আমাদের সঙ্গে মারপিট খেলায় দুম দুম করে এমন হাত চালায় যে পালিয়ে বাঁচি না। তুমি যদি দেখতে নন্দদা...।'

'তাই নাকি!'

'আমাদের খুব ইচ্ছে বেচারি ঘুষি শিখুক। কিন্তু ভাবতাম মেয়েরা আবার এসব পারবে নাকি। তোমার মুখে এতজনের নাম শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। এতগুলো মেয়ে যখন পেরেছে মুক্তোও পারবে না কেন? দাও না নন্দদা, কোথাও একটা ব্যবস্থা করে দাও। শুনেছি অনেক জায়গায় নাকি বালির বস্তা ঝুলিয়ে ঘুষি মারা শেখায়। মুক্তোও মারতে শিখুক।'

নন্দদা একটুখানি সময় কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ওরে বাবা, তোরা দেখছি তোদের ওই মুক্তোকে বক্সার না বানিয়ে ছাড়বি না। দেখ, আমার এক কাকা এরকম একটা ক্লাবের সঙ্গে আছে। সেক্রেটারি না প্রেসিডেন্ট। ক্লাবটাও তোদের ওখান থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানে বক্সিং, কুস্তি, মুগুর ভাঁজা সবই শেখানো হয়। কিন্তু মেয়েদের হয় কিনা তা বলতে পারব না। তাছাড়া অত ছোট মেয়ে... তবে আমি একবার বলে দেখব। কিন্তু ওর বাবা-মা কি রাজি হবে?'

পাতলুন বলল, 'ওটা নিয়ে ভাববেন না দাদা। মুক্তোর বাবা নেই। মাকে আমরা সবাই মিলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাব ঠিক।'

ভুজিয়া গলায় জোর এনে বলল, করাবই।'

নন্দদা হেসে বলল, ঠিক আছে, আমি খোঁজ নিচ্ছি। কাকার ওখানে যদি ব্যবস্থা থাকে তা হলে পয়সাকড়ি ম্যানেজ করার দায়িত্ব আমার। যা পালা এখন।'

আমরা পালাবার আগে নন্দদা আর একটা কাজ করল। ব্যাগ থেকে একটা ঝলমলে রঙিন ছবি বের করে আমার হাতে দিল। একটা মেয়ের ফটো। বলল, 'ইস্, দিতেই ভুলে যাচ্ছিলাম। এর নাম ক্যাথি ডেভিস। ইনি একজন দারুণ বক্সার। ওনার এই ফটো বেরিয়েছিল রিং পত্রিকায়। রিং পত্রিকা কী জানিস? ওখানে শুধুমাত্র বক্সিং নিয়েই লেখা থাকে। কালই তোর জন্য ইন্টারনেট থেকে ছবিটা নামিয়েছি। যা, ভালই হল, ছবিটা তোদের মুক্তোকে দিয়ে দিস। খুশি হবে।'

কথা শেষ করে নন্দদা টক করে সামনের বাসটায় উঠে পড়ল। আমরা কিছুই বুঝতে না পেরে থ' হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। হাতে ছবি। ছবিতে হাসিমুখের একটা মেয়ে। হাতে লাল রঙের ইয়া বড় দুটো গ্লাভস। গ্লাভস কাকে বলে আমরা তিনজনই জানি। আমাদের ফুটপাথের পিছনে একটা গ্লাভস তৈরির কারখানা আছে। বড় কিছু নয়, ছোট কারখানা।

পাতলুন বলল, 'মুক্তোর মাকে এই ছবিটা দেখালেই কাজ হয়ে যাবে। বলব, এই দেখ, মেয়েরাও ঘুষি মারে।'

ভুজিয়া বলল, 'এখন কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। আগে নন্দদা ব্যবস্থা করুক।'

আমি বললাম, 'ঠিক কথা। মুক্তোও যেন কিছু জানতে না পারে।'

খাটের স্বপ্ন কেমন আমার জানা নেই, কিন্তু ফুটপাথের স্বপ্নে শুধু খাবার থাকে। ভাল খাবার কিছু নয়, এই ভাত, ডাল, তরকারি এই সব। তবে পরিমাণে অনেকটা। অনেকটা আর গরম। আমরা প্রায়ই সেই সব স্বপ্ন দেখি। সেদিন আমি খাবারের বদলে মুক্তোর ঘুষির স্বপ্ন দেখলাম। মুক্তো নন্দদার দেওয়া ছবির মেয়েটার মতো বড় বড় দুটো গ্লাভস পরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে একটু নিচু হয়ে। পা দুটো সামান্য ফাঁক। মাথাটা তোলা। চোখগুলো জ্বলজ্বলে। মনে হচ্ছে,

এখুনি ঘুষি চালাবে। মারবে ভীষণ জোরে!

নন্দদার খবর দিতে একটু দেরি হল। ঠিক পাঁচদিন। তবে দেরি হলেও ভাল খবরই দিল নন্দদা। ওর কাকার ক্লাবে মেয়েদের বক্সিং শেখানো হয় না। তবে কাকা বলায় ও ওখানকার একজন ঘুষি মাস্টার মুক্তোকে আলাদা করে শেখাতে রাজি হয়েছে। বলেছে সপ্তাহে একদিন করে দেখিয়ে দেবে বিনি পয়সায়। কিন্তু আগে মেয়ের বাবা-মাকে দেখা করতে হবে।

খবরটা দিয়ে নন্দদা বলল, 'যাঃ, আমি তো অনেকটা করে দিলাম। এবার তোদের কাজ।'

না, আমাদের কোন কাজই নেই। নন্দদাকে কিছু বলিনি আমি। মাথা নেড়ে চলে এসেছি। মুক্তো, মুক্তোর মাকে কিছু বলতে হবে না। তারা আমাদের এই ফুটপাথ থেকে চলে গেছে তিনদিন হয়ে গেল। এটা অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। ফুটপাথের মানুষজন বেশিদিন এক জায়গায় থাকে না। আমিও চলে যাব। ভুজিয়া, পাতলুনরাও যাবে। হঠাৎ একদিন ভোরে, কারও ঘুম ভাঙার আগেই পোঁটলা নিয়ে হাঁটা মারবে। এটাই নিয়ম। ভুজিয়া আর পাতলুন নন্দদার খবর শুনে খুব দুঃখ করল। ইস্, এতদূর হয়েও হল না। মেয়েটা কোথায় গেল তাও যদি জানা যেত।

আমি এসব ভাবছি না। কারণ আমার মন বলছে মুক্তো যেখানেই থাকুক, সে নিশ্চয় লড়বে। একদিন সেও মস্ত বক্সার হবে। আমরা হয়ত চিনতে পারব না।

সব বক্সারকে কি আমরা চিনতে পারি?

ভূত তাড়ুয়া

আমরা দুই ভাই বোন পর্দার আড়ালে যেন বরফের মতো জমে গেছি! নড়তে পারছি না। এসব কী কথা! মতিলালকে দেখে কারা পালায়? কেন পালায়? কীসের মন্ত্র জানার কথা বলছেন বড় মামা? চোর-ডাকাত আবার তাড়াতে মন্ত্র লাগে নাকি?

লোকটার চেহারা চিমসে প্যাটার্নের। গায়ের রঙ কালো। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি আর ফতুয়া। দুটোই ফ্যাট্‌ফ্যাটে সাদা। যেন আসল সাদার ওপর আরও এক পোঁচ সাদা রঙ বোলানো হয়েছে। ফলে গায়ের রঙ হয়ে গেছে আরও কালো। একেবারে মিশ্‌মিশে। ঝাক্‌ড়া চুলে কষে তেল মেখেছে। যে কোনও সময় সেই তেল কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পারে। বারান্দার সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাতদুটো জোড়া করে। প্রণামের ভঙ্গি। মানুষটার চেহারায় আরও কোনও গোলমাল রয়েছে। সেটা চোখের সামনেই আছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না। চোখের সামনে কিছু থাকা সত্ত্বেও ধরতে না পারলে অস্বস্তি হয়।

আমাদেরও হচ্ছে।

বড় মামা দু'বার গলা খাঁকারি দিলেন। বললেন, "মতিলাল,

ভবানী যো বোলা কেয়া ও সাচ্ হ্যায়? সত্যি কথা বলছে?” লোকটা চুপ করে রইল। ভবানীদা এবার ধমক দিল, “বোল্, চুপ কিঁউ হো? ও সাচ্ হায় না?” মতিলাল দুটো হাত কচলাতে কচলাতে কাঁচুমাঁচু ভঙ্গিতে বলল, “সাচ্ হ্যায়।” লোকটার গলাটা কেমন যেন। পরিষ্কার নয়, আবার জড়ানোও নয়। ফ্যাঁস ফ্যাঁসে। বড় মামা চমকে দিয়ে 'হো হো' আওয়াজ করে হেসে উঠলেন। তারপর চেয়ার থেকে ঝুঁকে পরে বললেন, “সত্যি, তুমি তাড়াতে জানও?” মতিলাল ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, “নেহি বাবু হাম কুছ নেহি জানি। ওরাই হামাকে দেখে ভাগে।”

“ভাগে! তোমাকে দেখে পালায়? কিউ? ওদের ভাগানোর জন্য তুমহারা পাস্ কুছ্ তন্ত্র মন্ত্র হ্যায়?”

বড় মামার মুখে হাসি। বোঝাই যাচ্ছে তিনি মজা পেয়েছেন। মতিলাল ফিসফিস করে বলল, “নেহি, কুছু নেহি। ফিরভি ও ভাগতা হ্যায়। লেকিন কিঁউ ইয়ে হাম নেহি জানতা বাবু! ও ভাগতা হায়।”

টক্ টক্ টক্।

কোথাও একটা তক্ষক ডেকে উঠল। বিকেলবেলা তক্ষক ডাকে? কে জানে ডাকে হয়তো। এটা তো কলকাতা নয় যে সবকিছু নিয়ম এমন চলবে। জায়গাটা অনেকটা একটা পাড়াগাঁয়ের মতো। তাও আবার আমাদের চোনাজানা পাড়াগাঁ নয়, বিহারের পাড়াগাঁ। মধুপুর থেকে কিছুটা দূরে। রেল স্টেশনে নামার পর টাঙায় আধঘণ্টার পথ। আমাদের অবশ্য আরও বেশি সময় লেগেছে। কারণ যে ঘোড়াটা টাঙা টানছিল তার অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। মনে হয়, বেচারির রাতে ঠিক মতো ঘুম হয়নি। ছোটার মাঝখানেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছিল। ঘোড়ার ওপর ভবানীদা বেজায় খাপ্পা হয়ে গেল। দেহাতি হিন্দিতে টাঙাওলাকে এই মারেতো সেই মারে। আর বিড়বিড় করে নিজের মনে খালি বলতে লাগল, ‘ইস্ দেরি হয়ে গেল। ইস্ দেরি হয়ে গেল।”

আমি বললাম, “কীসের দেরি ভবানীদা?”

ভবানীদা বিরক্ত গলায় বলল, “তোমাদের বড়মামা বাড়ি পাহারার জন্য নতুন দারোয়ান খুঁজছেন। আজ বিকেলে একজনকে

আসতে বলেছি। তার ইন্টারভিউ হবে। তারপর ফাইনাল করব।"

আমি বললাম, 'আজই বললে?"

ভবানীদা রাগী গলায় বলল, 'আমি কি ছাই জানতাম যে ট্রেন লেট হবে? তারওপর এই হতচ্ছাড়া ঘোড়াটা...।"

কথা শেষ করে ভবানীদা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নিজেই ঝিমিয়ে পড়া ঘোড়াকে বলতে লাগলেন, "হ্যাট্ হ্যাট্। জলদি চল্।" গোড়া 'চিঁহি' ধরনের একটা ডাক দিয়ে আরও স্পিড কমিয়ে দিল। মধুপুর, দেওঘর, জসিডিতে একটা সময় অনেক বাঙালি থাকত। এখনও কম কিছু নেই। তারওপর আসা যাওয়া তো লেগেই আছে। তাই এখানকার স্থানীয় মানুষরাও সুন্দর বাংলা বলতে পারে। যেমন এই ভবানীদা। তার কথা শুনলে কে বলবে মানুষটা বাঙালি নয়? দেহাতি টাঙাওলাও তেমনি। হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে গড়গড় করে বলল, "ঘোড়াকে আপনি কিছু বলেন না কত্তা। রাগ করে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন মাঝপথে সমস্যা আছে। আপনি অত চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক নিয়ে যাব।"

গুঞ্জা মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠল। ভবানীদা টাঙাওলাকে ধমক দিল, "চোপ্। একদম চোপ্। আমি কী এমনি চিন্তা করি? শুধু দারোয়ান হলে ভাবতাম থোড়াই। অন্য ব্যাপার আছে। লোকটা হাতছাড়া হয়ে গেলে বিরাট ক্ষতি। অনেক কষ্টে এর খোঁজ পেয়েছি। তুমি বক্‌বক্ না করে তাড়াতাড়ি চল দেখি।"

আমি অবাক হলে বললাম, "আর কী ব্যাপার?"

ভবানীদা মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো চক্‌চকে করে বলল, "শুধু বাড়ি পাহারা নয়, শুনেছি এ লোকের আরও ক্ষমতা আছে। তোমাদের বড় মামাকে সেই ক্ষমতার কথা বলেছি। উনি তো বিশ্বাসই করেন না। বললেন, দূর যতসব বানানো কথা। আমি অনেক জোরজার করলাম। বললাম, একবার দেখতে ক্ষতি কী? তখন রাজি হলেন।"

গুঞ্জা তার গলায় ঝোলানো দূরবীন চোখে লাগিয়ে চারপাশ দেখছে। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই এই কাণ্ড শুরু করছে। চোখ থেকে দূরবীন সরাচ্ছে না। দূরবীন চোখেই ভবানীদার দিকে তাকিয়ে বলল,

"কী ক্ষমতা?"

ভবানীদা একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "অত বলা যাবে না।"

সেই লোকেরই এখন ইন্টারভিউ চলছে। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমরা শুনছি।

বছর দুই হল বড়মামা এখানে একটা দারুণ রেস্ট হাউস কিনেছেন। বিরাট বাগানের মাঝখানে ব্রিটিশ আমলের ছোট্ট একটা বাংলো। বাংলোর রঙ পোড়া ইঁটের মতো। ভারি চমৎকার। সারিয়ে সুরিয়ে নিয়ে সেটাকে আরও চমৎকার করা হয়েছে। মনে হয় সত্যি নয়, আঁকা ছবি। সামনে ফুলের বাগান। পাশে সবজি। যাকে বলে কিচেন গার্ডেন। পিছনে আম, জারুল, সিলভার ওকের মতো বড় বড় সব গাছ ভিড় করে আছে দেওয়ালের মতো। একদিকে পুকুর। সেখানে বাঁধানো ঘাট। দক্ষিণের কাঁচের আউট হাউসটাও কম যায় না। রঙিন কাঁচগুলো ছিল ভাঙা, বড়মামা কলকাতা থেকে অনেক খুঁজে নিয়ে এসে সেসব বদলেছেন। কত মানুষ যে এখন এই বাড়িটা কেনার জন্য বড়মামাকে ধরে তার ঠিক নেই। মোটা টাকার কথাও বলে। বড়মামা পাত্তা দেন না।

আমরা এসে পৌঁছেছি বেশিক্ষণ হয়নি। কিন্তু তার মধ্যেই এক চক্কর ঘোরা হয়ে গেছে। বাংলোর চারপাশে জঙ্গল না থাকলেও বেশ জঙ্গল জঙ্গল একটা ভাবও রয়েছে। এটা একটা বাড়তি মজা। বড়মামা বিয়ে থা করেননি। ঝাড়া হাত পা'র মানুষ। ব্যবসাপাতি থেকে ছুটি নিয়ে বছরে দু'তিন বার বিশ্রাম নিতে এখানে পালিয়ে আসেন। এবার ঠিক হয়েছিল বাবা, মা আর আমরা দু'ভাই বোনও আসব। গোছগাছ শেষ এমন সময় বাবার অফিসে হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ল। বেড়ানো পণ্ড। গুঞ্জা তো কেঁদেই ফেলল। মা বড় মামাকে খবর দিল, যাওয়া ক্যানসেল। তখন বড় মামাই ব্যবস্থা করেছেন। ভবানীদাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে-ই আমাদের দুই ভাই বোনকে নিয়ে আজ সকালে ট্রেনে উঠেছে।

কথা ছিল দুপুর গড়াতে না গড়াতে মধুপুরে নামব। ট্রেন লেট করল। পৌঁছোতে বিকেল হয়ে গেছে। বেলা বারোটায় হটকেস খুলে

মার দেওয়া লুচি, আলুর দম আর দরবেশ দিয়ে লাঞ্চ করেছি। লুচি গরম ছিল। তারপর আর কিছু খাওয়া হয়নি। তবে বেড়ানোর আনন্দে খিদে ভুলে গেছি। ঠিক হয়েছে, বাবার অফিসের কাজ শেষ হলে তিনদিন পর বাবা মাও চলে আসবে। ততদিন আবার দুই ভাই বোন একেবারে স্বাধীন।

কিন্তু প্রথম দিনই যে এরকম একটা কাণ্ড হবে কে ভাবতে পেরেছিল?

বারান্দার ওপাশের ঝোপঝাড় দিয়ে কিছু চলে গেল। আওয়াজ হল, সর্ সর্ সর...। গুঞ্জা ফিসফিস করে বলল, "দাদা, ভয় করছে।" গুঞ্জা খুবই ভীতু প্রকৃতির একটা মেয়ে, হুট্‌হাট্ ভয় পাওয়া তার অভ্যেস। ভেবেছিলাম, ক্লাস সিক্সে উঠলে মেয়েটার ভয় কমবে। কমেনি, বরং বেড়েছে। অথচ আমি ওর থেকে মোটে দু'বছরের বড় হলে কী হবে যথেষ্ট সাহসী। কিন্তু এখন যেন কেমন হচ্ছে! মতিলাল নামের লোকটার সঙ্গে বড় মামার কথা শোনার পর থেকে এটা হচ্ছে। কী হচ্ছে?

আমি হাত বাড়িয়ে গুঞ্জাকে একটা চিমটি দিলাম। বড় মামা আমাদের কথা শুনতে পেলে কেলেঙ্কারি। একটু আগেই তিনি বলেছেন, "অর্ঘ, গুঞ্জা তোমরা ট্রেনে এতটা পথ এসেছো, এখন আর ঘর থেকে একদম বেরোবে না। খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নাও। সেই ফাঁকে আমি একটা জরুরি কাজ সেরে ফেলি। সন্ধেবেলা তোমাদের সঙ্গে আবার জমিয়ে গল্প হবে।" আমরা ভাই বোনে হাত পা ধুয়ে খাওয়া দাওয়া করেছি, কিন্তু বড়মামার বিশ্রাম নেওয়ার কথা শুনিনি। ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে চলে এসেছি বারান্দায়। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে 'দারোয়ান' চাকরির ইন্টারভিউ শুনছি।

বেতের চেয়ারে বড়মামা বসে আছেন। তাঁর ভুরুদুটো কোঁচকানো। ভবানীদা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। তারও ভুরুদুটো কোঁচকানো। লক্ষ্য করছি ভবানীদার এই এক স্বভাব। বড়মামার কাছে থাকলে তার মতো আচরণ করবে। এখনও তাই করছে। বড়মামার দেখাদেখি ভুরু কুঁচকে আছে।

বড়মামা ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'ভবানী এই সেই লোক? এর

কথাই তুমি বলছিলে?”

ভবানীদা ঘাড় নিচু করে বলল, “হ্যাঁ বড়বাবু, এই সেই লোক।”

বড়মামা গলা তুলে বললেন, “তুমহারা নাম কেয়া হ্যায়? নাম কী?”

ভবানীদাও গলা তুলে বলল, “কেয়া হ্যায়?”

ভবানীদা বেশ কয়েক বছর ধরে এ বাড়িতে আছে। সে এই বাড়ির কেয়ারটেকার। আগে কেয়ারটেকার আর দারোয়ান দুটো পোস্টেই কাজ করত। এখন শুধু কেয়ারটেকার। এর পিছনে একটা মজার গল্প আছে। ট্রেনে আসতে আসতে ভবানীদা নিজেই আমাদের সেই গল্প বলেছে। গত বর্ষায় তার নাকি জ্বর হয়েছিল। ছোটখাটো জ্বর নয়, একেবারে তেড়েফুড়ে জ্বর। গোটা শরীর থেকে যেন ধোঁয়া বের হতো! মাথায় পুকুরের ঠাণ্ডা জল বালতি বালতি ঢেলেও টেম্পারেচার কমছিল না। গুনে গুনে সাত দিন বাদে জ্বর গেল কিন্তু এখানে শুরু হল বিচ্ছিরি এক ঝামেলা। দিনের বেলা সব ঠিক থাকে, কিন্তু রাত হলে কেন জানি দুটো কানেই তালা পরে যায়! কিছুই শুনতে পায় না ভবানীদা। অনেক ডাক্তার বদ্যি হল, দেওঘরের কাছে কোন গ্রামে গিয়ে ওঝা পর্যন্ত দেখিয়ে এলো ভবানীদা। ওঝা বলল, “কোন ব্যাপার নয়। এক ধুনুচি ধাঁয়া দিলেই রোগ পালাবে। তবে খরচাপাতি আছে।” বেচারি ভবানীদার উপায় কী? খরচায় রাজি হয়ে গেল। ওঝা কানে ধোঁয়া দিল। এক ধুনুচির বদলে তিন ধুনুচি। খরচও হল তিনগুণ। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হল না। কানের গোলমাল রয়েই গেল। যে মানুষ রাতে কানে শুনতে পায় না তাকে আর যাই হোক বাড়ি পাহারার কাজে রাখা যায় না। এই কারণেই ভবানীদার দারোয়ান পোস্ট চলে গেছে। তবে আমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই বুঝেছি, পোস্ট চলে গেলেও ভবানীদা মানুষটা ভাল। আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করেছে। বলেছে একদিন সাইকেলে চাপিয়ে ডুংরা পাহাড়েও নিয়ে যাবে। আমি কেরিয়ারে বসব, গুঞ্জা বসবে সামনের রডে। বড়মামার রেস্ট হাউসের পাশে ডুংরা একটা ছোট পাহাড়। টিলার থেকে খানিকটা বড়। পাহাড়টায় একটা মজা আছে। ওখানে একটা ঝরনা রয়েছে। সেটার নামও ডুংরা। পাহাড়ের নামে ঝরনা না ঝরনার নামে পাহাড় সেটা

কেউ জানে না। রাতে এই নিয়ে পাহাড় আর ঝরনার মধ্যে নাকি ঝগড়া হয়! ঘর থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় কান পাতলে সেই ঝগড়া শোনা যাবে। তবে সবদিন শোনা যায় না। যেদিন যেদিন খুব চাঁদের আলো ফোটে সেদিন শোনা যায়।

গুঞ্জা হাততালি দিয়ে বলল, "না, শুনবে না। রাতে ঘর থেকে বেরনোয় সমস্যা আছে।"

আমি বললাম, "কী সমস্যা?"

ভবানীদা উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। যেন কথাটা শুনতেই পায়নি।

ভবানীদার কান বন্ধ হওয়ার পর বড়মামা এই প্রথম এখানে এলেন। তাই এখন পাহারার জন্য নতুন লোকের খোঁজ চলছে। এর মধ্যে পাঁচ জনের ইন্টারভিউ হয়ে গেছে। একজনকেও পছন্দ হয়নি। এই মানুষটাকে নাকি ভবানীদা নিজে অনেক খুঁজে টুঁজে জোগাড় করেছে।

বাগানের ডুমুর গাছটা থেকে ঝটপটানি দিয়ে একটা পাখি উড়ে গেল। পেঁচা নয়তো? হতে পারে। এখানে দিনের আলোতেও হয়তো পেঁচা ওড়ে। চমকে উঠে গুঞ্জা আরও খানিকটা সরে এলো এদিকে। আমার ডান হাতের কনুইটা চেপে ধরল।

শুরু থেকেই দেখছি, লোকটা হাসছে। মুখে খয়েরি দাঁতের সারি। এটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। অনেকেই পান দোক্তা বেশি খেয়ে দাঁত খয়েরি করে ফেলে। এরও হয়তো সেটা হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, লোকটার হাসি যেন মুখের থেকেও বড়! দুটো গাল ছাড়িয়ে চলে এসেছে অনেকটা বাইরে! দেখলে কেমন যেন লাগে। গা ছমছমে একটা অস্বস্তি। আমি পর্দার আরও আড়ালে সরে এলাম।

লোকটা ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় নিজের নাম বলল, "মতি বাবু। হামারা নাম মতি। মতিলাল।"

এরপরই বড় মামা মতিলালকে মন্ত্রর কথা জিগ্যেস করেন। আমরাও ঘাবড়ে যাই। মন্ত্র! কীসের মন্ত্র? কাদের তাড়ানোর কথা বলছে ও? গুঞ্জা কোনও রকমে হাত বাড়িয়ে আমার কব্জিটা ধরল। ছাড়াতে গিয়েও আমি পারলাম না। বরফের মতো জমে গেছি যেন!

আমরা ঘাবড়ে গেলে কী হবে, বড়মামা কিন্তু হাসলেন। হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়ালেন। ভবানীদার দিকে ফিরে বললেন, "ঠিক আছে ভবানী, তুই মতিলালের সঙ্গে ফাইনাল কথা বলে নে। আজ থেকেই ও কাজে নেমে পড়ুক। কদিন ওর কাজকর্ম দেখে মাইনে পত্তর ঠিক করব না হয়। আর ওকে বলে দে ওসব আজগুবি কাণ্ডকারবারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। শুধু চোর ডাকাত তাড়ালেই চলবে। আর কাউকে এখান থেকে তাড়াতে হবে না। ও বরং আজ রাত থেকে ডিউটি শুরু করে দিক। দেখ বাপু, রাতে আবার পুকুর ঘাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড় না।"

"বাবু, হাম রাত মে সোনে্ নেহি।"

বড়মামা বললেন, "ওরকম সবাই বলে। পরে দেখা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছো। আর চোরে এসে আমরা বাগানের সবজি, পুকুরের মাছ সব নিয়ে পালিয়েছে।"

"নেহি বাবু হাম ঝুট্ নেহি বোলতে।"

রাত দশটার পর এখানে প্রায় কোনদিনই আলো থাকে না। অন্য সময়ও না থাকার মতো। ভোল্টেজ কম। টিউব লাইটের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না, বাল্বগুলো জ্বলে টিম্‌টিম্ করে। এখনও সেই অবস্থা। দারুণ লাগছে। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো। সন্ধের পর বসার ঘরে ক্যারম্ খেলছি। আমরা আসব বলে বড়মামা ক্যারম বোর্ডের ব্যবস্থা করেছেন। খুব জমিয়ে খেলা চলছে। শুধু মনের মধ্যে কেমন একটা খচ্ খচে ভাব। মতিলালের ঘটনাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। সুযোগ পেয়ে ভবানীদাকে দু-একবার জিগ্যেস করেছিলাম, উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেছে।

বড় মামাকে প্রথমে চেপে ধরল গুঞ্জা। তারপর আমি। বড় মামা প্রথমটায় চুপ করে রইলেন। তারপর স্টাইকারের আলতো ছোঁয়ায় 'রেড' ফেলে বললেন, "দূর ও কিছু নয়। ভীতুর কাণ্ড। তোরা ছাড়্ তো এসব। ইস্ কতবছর যে ক্যারম্ খেলিনি। কত বছর হবে? তিরিশ? চল্লিশ? বেশিও হতে পারে। ভাগ্যিস তোরা এলি। চল্লিশ বছর পরেও হাতে কেমন টিপ্ দেখেছিস্? দেখ এবার ওই গুটিটা ফেলব।"

আমি বললাম, "খুব ভাল টিপ্। এবার বল কে ভীতু?"

বড় মামা মুচকি হেসে বললেন, "কে আবার? ওই ভবানীটা।"

ভবানীদা ভীতু শুনে গুঞ্জা আর আমি মুখের দিকে তাকালাম।

গুঞ্জা বলল, "মানে!"

বড়মামা তখন গুছিয়ে সবটা বললেন।

"এবার এখানে এসে থেকেই দেখছি ভবানী কেমন যেন হয়ে গেছে। একেই তো গত বর্ষার জ্বরে শরীরটা ভেঙে গেছে, তারওপর দেখলাম মনটাও ভেঙেছে। প্রথমদিনই বলল, বাবু, দিনের সব কাজ পারব কিন্তু রাতে আমায় ছেড়ে দিন। রাতে এখানে থাকতে পারব না। আমার তো মাথায় হাত। কী মুশকিলের কথা। এত বড় বাড়ি, এত জিনিস। রাতে পাহারা না দিলে চলে? ভবানীর মতো বিশ্বাসী মানুষ পাওয়াটাও তো সহজ কথা নয়। আমি ওকে বললাম, তোমার আবার কী হল? ঠিক আছে মাইনে না হয় কিছুটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। ও বলল না, মাইনে নয়, অন্য সমস্যা আছে। আমি বললাম, অন্য সমস্যা! সেটা আবার কী!" কথা থামিয়ে বড় মামা ঝুঁকে পরে একটা গুটি ফেললেন। আমি আড় চোখে তাকিয়ে দেখি গুঞ্জার চোখ বড় হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "তারপর?" ভীতুদের নিয়ে এই এক মুশকিল। ভয়ও পাবে আবার ভয়ের গল্প শুনতেও চাইবে। বড় মামা বলতে লাগলেন—

"ভবানী তখন বলল, সে নাকি আজকাল রাতে এই বাড়ির আশেপাশে নানা রকম আওয়াজ পায়। আমি বললাম, কী রকম আওয়াজ? বলল, কারা যেন কথা বলছে, কে যেন হাঁটছে—এই সব আওয়াজ। বুঝলাম ডাহা মিথ্যে কথা। বেটা কোনও কারণে ভয় পেয়েছে।"

এবার আমি নড়ে চড়ে বসলাম। ভবানীদা রাতে আওয়াজ পায়! তাহলে যে আমাদের বলেছিল, জ্বরের পর রাতে কানে শুনতে পায় না! কোনটা সত্যি? কথাটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলাম।

বড় মামা বললেন, "বুঝলি অর্ঘ অনিচ্ছুক মানুষকে দিয়ে সব কাজ করানো যায়, কিন্তু পাহারার কাজ করানো যায় না। বাধ্য হয়ে একজন দারোয়ান খুঁজতে শুরু করলাম। দু-একজনকে দেখলাম, মনোমত হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই লোকটাকে ভবানীই এনে দিল।

এই যে ভবলাল না মতিলাল কী নাম যেন।" এরপর বড় মামা মুখ তুলে তাকালেন। হেসে বললেন, "বাড়ি পাহারা ছাড়াও এই মতিলালবাবুর নাকি আরও একটা ক্ষমতা আছে। মিস্টিরিয়াস পাওয়ার। রহস্যময় ক্ষমতা।"

"মিস্টিরিয়াস পাওয়ার!"

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বললাম।

বড় মামা প্রথমে একচোট হেসে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতেই বলতে লাগলেন।

"ভবানী বলছিল, লোকটা নাকি বাড়ি ঘর থেকে ভূত তাড়াতে পারে। হা হা। গ্রামের দিকে অনেকেই নাকি ভূত তাড়াবার জন্য মতিকে ডেকে নিয়ে যায়। দু'চার রাত সেই বাড়িতে থাকলেই ব্যস্, তাতেই কেল্লা ফতে। আর কিছু লাগে না। ভূত বাবাজী এমনই বাপ্ বাপ্ বলে পালায়। বোঝ কাণ্ড। হা হা। আজ বিকেলে মতিলালকে মজা করে কথাটা আমি জিগ্যেস করলাম। ঘটনা সত্যি কিনা জানতে চাই। লোকটা কী বলল জানিস? বলল, ঘটনা সত্যি! ভূত নাকি ওকে দেখলে পালায়! কোন মন্ত্র টন্ত্র লাগে না, এমনিই চম্পট দেয়। হা হা। প্রথমে ভেবেছিলাম, লোকটাকে রাখব না। একটা মিথ্যেবাদীকে বাড়িতে ঢোকানো ঠিক হবে না। তারপর ভেবে দেখলাম, অসুবিধে কী? মিথ্যেটা তো ক্ষতির কিছু নয়, বরং মজার। কটা দিন দেখি না। তাছাড়া...।" এতটা পর্যন্ত বলে বড় মামা থামলেন।

আমি বললাম, "তাছাড়া কী?"

"তাছাড়া ভবানীটাও কদিন ধরে খুব চাইছিল লোকটাকে যেন রাখি।"

"কেন? ভবানীদা চাইছিল লোকটাকে যেন রাখি।"

"কেন? ভবানীদা চাইছিল কেন?" গুঞ্জা জিগ্যেস করল।

বড় মামা আবার হাসলেন। বললেন, "কেন আবার, একটা কাউকে না রাখলে ভবানীরই তো সব থেকে মুশকিল। ওকেই রাতে পাহারা দিতে হবে। আরও একটা কারণ হতে পারে। হয়তো লোকটা ভবানীর পরিচিত। গরিব মানুষ। বেচারি কাজকর্ম পাচ্ছে না, এই সব বানানো কথা বলে চাকরিটা করিয়ে দিতে চাইছে ভবানী। তবে ভবানী

এ বাড়ির ভালই চাইবে। সে আমার অনেকদিনের পরিচিত। এই সব ভেবে মতিলালকে রেখেই দিলাম। দেখি না কটা দিন। অনেক বাড়িতে তো কাকতাড়ুয়া থাকে, আমার এখানে না হয় একটা ভূততাড়ুয়া রইল। হা হা। তোরা ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বলবি, বড় মামার রেস্টহাউসে একটা ভূত তাড়ুয়া আছে। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো আর জামাকাপড় ফট্‌ফটে সাদা। হা হা।"

বড়মামা একেবারে গলা খুলে হাসতে লাগলেন। 'ভূত তাড়ুয়া' কথাটা শুনে আমাদেরও খুব মজা লাগল। সব ভয় টয় পালালো। আমরাও হাসতে শুরু করলাম। ভীতু গুঞ্জাটা পর্যন্ত এতো হাসল যে ওর হেচকি ওঠার মতো অবস্থা। বড় মামা মাথায় চাপড় দিয়ে সামলালেন।

রাতে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঘুম হল চমৎকার। একেবারে একঘুমে রাত কাবার। শুরুতে আউটহাউসের দিক থেকে শুধু একবার তীক্ষ্ণ একটা হুইশ্‌লের আওয়াজ পেলাম। পাহারাদারের হুইশল্‌। ভূত তাড়ুয়া কি মাথায় ছাতা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে? নাকি রেনকোট গায়ে দিয়েছে? ভূত কি রেনকোট দেখলে ভয় পালায়? এই সব হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পরলাম আবার। সকালে উঠে দেখি, চারপাশ একেবারে আলোয় ঝলমলে। ঘর থেকে বেরিয়ে শুনি হইচই হচ্ছে। বড় মামা অর্ডার দিয়েছেন বাড়ির পিছনে সিলভার ওক গাছটায় দড়ির দোলনা টাঙাতে হবে। আমি আর গুঞ্জা নাকি আজ সেই দোলনায় বসে ব্রেকফাস্ট করব। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, ভবানীদা দোলনা নিয়ে ছোটাছুটি করছে।

ইস্‌ কী মজা!

মজা চলল পরের কটা দিন। অনেকরকম মজা। শুধু ঘরে বসে ক্যারম্‌ নয়, মাছ ধরা, গাছে ওঠা, পিকনিক, ক্যাম্প ফায়ার অনেক কিছু। সব থেকে মজা হল, বাবা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলায় তিন দিনের বদলে দেড়দিনের মাথায় মাকে নিয়ে চলে এল সোজা গাড়ি নিয়ে। তারপর থেকে আমরা গাড়িতেই বেড়াতে লাগলাম। দেওঘর গেলাম। ডুংরা পাহাড়েও গেলাম। হইচইতে এতো মেতে উঠলাম যে ভবানীদা আসছে না সেটাও খেয়াল করলাম না। ভূত তাড়ুয়া

মতিলালের সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। সে রাত করে আসে। পাহারা সেরে ফিরে যায় ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। বাবা-মাকে গল্পটা বলেছি। বাবা বলেছে, একদিন রাতে ডেকে কথা বলবে। মা বলল, "না, বাবা ওসব ভূত টুতের ব্যাপার। খবরদার রাতে আমার সামনে ডাকবে না। বড়দা যে কী কাণ্ড করে। কাদের সব ধরে আনে।"

মায়ের কথা শুনে আমরা খুব হাসলাম। বড়মামা বলল, "আমি কী করেছি। করেছে তো ভবানী। সেই তো লোকটাকে এনেছে। এনে এখন কামাই করছে। মনে হয় বেচারি আবার জ্বরে পড়েছে। ভাবছি এবার কলকাতায় ফেরবার আগে একবার ওর গ্রামের বাড়িতে যাব। গতবার অসুখের সময় আমি এখানে ছিলাম না। এবার না গেলে খুবই খারাপ হবে। সমস্যা হল, গ্রামের নামটা বলেছিল, কিন্তু এখন ঠিক মনে পড়ছে না। যাই হোক খুঁজে নিতে হবে। ওই আজগুবি মতিলাল নিশ্চয় ঠিকানা বলতে পারবে।"

আমি আর গুঞ্জা দুজনেই একসঙ্গে বললাম, "আমরাও তোমার সঙ্গে যাব বড়মামা। বেশ আর একটা আউটিং হবে। ভবানীদাও খুশি হবে।"

বড়মামা বলেন, "না, আমি একাই যাব। আজ বিকেলেই চট করে একবার ঘুরে আসব।"

সাতদিনের বদলে পাঁচদিনের মাথায় আমরা কলকাতায় ফিরে এসেছি। বড় মামাও তার চমৎকার রেস্টহাউসে বড় একটা তালা ঝুলিয়ে চলে এসেছেন আমাদের সঙ্গে। উনি বাড়ি বিক্রি করে দেবেন। ইতিমধ্যেই ওখানে যারা একসময় বাড়ি কিনব বলে উৎসাহ দেখিয়েছিল তাদের দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন।

এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে তাতে ওখানে আর থাকা যায় না।

ঘটনা এরকম—

সেদিন বড়মামা যখন ঠিকানা খুঁজে ভবানীদার গ্রামে পৌঁছোলেন তখন কড়া দুপুর। সূর্য একেবারে মাথার ওপর। গ্রামের মুখে বন্ধ চায়ের দোকানে বসে কটা লোক তাস খেলছিল। বড়মামা গাড়ি থেকে নামতে

নিজেরাই এগিয়ে এল। তারপর ভবানীদার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল! গতবর্ষায় সাতদিনের জ্বরে যে মানুষটা মারা গেছে তার আবার খোঁজ কীসের! সে তো অনেকদিন হয়ে গেছে।

এরপর আর এই বাড়ি রেখে দেওয়া যায়?

·এই ঘটনার বেশ কয়েকমাস পরে গুঞ্জা একদিন আমাকে জিগ্যেস করল, "আচ্ছা দাদা, ভবানীদা যখন নিজেই ভূত তখন একজন ভূত তাড়ুয়াকে ডেকে আনতে গেল কেন?"

আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। কারণ ঠিক উত্তর আমি জানি না। হতে পারে, মারা যাওয়ার পরও ভবানীদা দায়িত্ব ছেড়ে চলে যেতে পারছিল না। বড়মামা আর ওই বাড়ির মায়া কাটাতে পারছিল না কিছুতেই। হয়তো তাই ভূত তাড়ুয়া মতিলালকে এনে চলে যাওয়ার একটা উপায় বের করেছিল। আবার এগুলো সব মিথ্যেও হতে পারে। চমৎকার রেসহাউসটা যাতে বড়মামা বিক্রি করে দেন তার জন্য ফন্দি। বর্ষায় জ্বর, রাতে কানে শুনতে না পাওয়া থেকে শুরু করে, ভূত তাড়ুয়া মতলিালকে নিয়ে আসা, গ্রামের কটা লোককে দিয়ে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া—সবকিছু বানানো।

কোনটা সত্যি কে জানে?

আশ্চর্য পুকুর
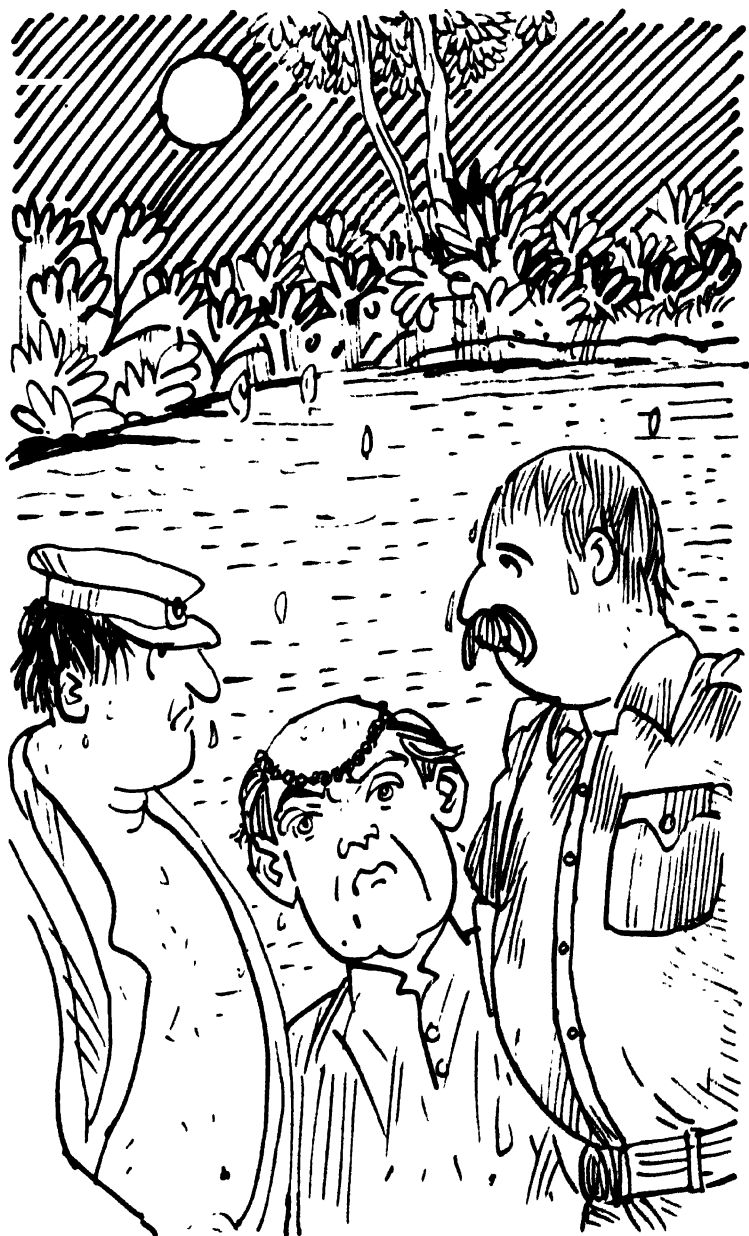
আশ্চর্য পুকুর

চমৎকার পুকুর

ভুবনপুরের পুবদিকে বোসদের বাগান। বাগান না বলে ওটাকে এখন জঙ্গলই বলা উচিত। কতবছর যে ঐ বাগানে মালি ঢোকেনি তার কোনও ঠিক নেই। বছরের পর বছর ওখানকার আগাছাও পরিষ্কার করা হয় না, ঘাস ছাঁটাও হয় না। বাগানটার যারা মালিক সেই বোসদেরও ভুবনপুরের কেউ চোখে দেখেনি। একজন, দু'জন দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁরা এত বুড়ো হয়ে গেছেন যে কানে কিছু শুনতে পান না। সুতরাং তাঁদের এসম্পর্কে প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই।

বাগান কিন্তু অনেক বড়। ভাঙাচোরা নোনা ধরা ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অবশ্য ভেতরকার গাছগুলো যে সব জংলি এমন নয়। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আমলকির মত জিভে জল আনা সব ফলের গাছ আছে। আছে করবী, নয়নতারা, কৃষ্ণচূড়া, চাঁপা, টগরের মত সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। আর আছে চমৎকার একটা পুকুর। বাগানের একদম মাঝখানে। একদিকে কলাগাছের ঝাড়, অন্যদিকে তাল আর নারকেল গাছের সারি যেন পুকুরটাকে ঘিরে জায়গাটাকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা করে রেখেছে। পুকুরের উত্তর আর দক্ষিণ দু'দিকে দুটো লাল রঙের ঘাট। সেই ঘাটের বেশিরভাগ সিঁড়িই আজ ভেঙে পড়েছে। সিঁড়ির ফাটল থেকে বটগাছের চারা মাথা তুলেছে। তবে পুকুরের জলটা কিন্তু আজও খুব ভাল আছে। টলটলে, পরিষ্কার। কাচের মত। জলের একদিকে শালুক ফুল ফুটে ভাসছে, একদিকে পাতিহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে সাঁতরে বেড়াচ্ছে আর মন দিয়ে গুগুলি খুঁজছে। কখনও সখনও তালগাছ থেকে পাকা তাল হয়ত ঝুপুং করে জলে পড়ল, কখনও বা ইয়া বড় কোনও কাতলা মাছ ঘাই দিল ঘুপুত করে।

বোসদের এই বাগানের কারোর ঢোকার সাধ্যি নেই। ঢুকবে কী করে? একবার বড়দিনের ছুটিতে ভুবনপুর তরুণ সংঘ ক্লাবের ছেলেরা এই বাগানে ঢুকে পিকনিক করছিল। মাইক বাজিয়ে তারা বেজায় শোরগোল পাকিয়েছিল। তারপর বীরত্ব দেখিয়ে যেই তারা একটা মৌচাক ভেঙে মধু নিতে গিয়েছিল অমনি কয়েক'শ মৌমাছি তাদের এমন কামড় দেয় যে, এক একজনের চোখ মুখ হাঁড়ির মত ফুলে ওঠে। শুধু তাই নয়, জ্বালার চোটে পিকনিক পার্টি এক হাঁড়িতেই মাংস, ডাল, চাটনি রান্না করে এবং সেই অদ্ভুত খিচুড়ি খেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। এরপর আর কেউ ওখানে পিকনিক করতে যায়নি। তবে দত্তবাড়ির মেজ ছেলে একবার সিনেমার ভিলেনদের মত জুতোজামা পরে, কাঁধে এয়ারগান ঝুলিয়ে বোসবাগানে খরগোস শিকারে গিয়েছিল। সেবার গর্তে পড়ে, পা ভেঙে তাকে ফিরতে হল। অনেকেই তাকে গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করেছিল, শুনলাম বোসবাগানে শিকার করতে গিয়ে তুমি নাকি নিজেই জন্তুদের জন্য পাতা ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলে?

এই অপমানের পর দত্তবাড়ির মেজ ছেলে আর কোনওদিন এয়ারগান ধরেনি।

ঘনাই কাণ্ড

ছ'ফুট তিন ইঞ্চি উঁচু পাঁচিলটা টপকে টুপ্ করে বোসবাগানে এসে পড়ল ঘনাই। তার কাঁধে একটা ভারী থলে। সে হাঁপাচ্ছে।

মাকড়সার জাল আর শেয়ালকাঁটা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল ঘনাই। গতরাতে খানিকটা বেশি হয়েছে। পরপর পাঁচটা বাড়িতে চুরি তো কম কথা নয়। কোনটাতে সিঁদ কেটে, কোনটাতে গরাদ ভেঙে, কোনটাতে আবার পাইপ বেয়ে। শেষের বাড়িটায় তো ধরা পড়ে যাচ্ছিল বলে। দারোয়ান ব্যাটা কাঁধটা খামচেও ধরেছিল। খুব বাঁচোয়া ভাল করে তেল মাখা ছিল। তাই হড়াৎ করে ফসকে আসতে পেরেছে। অবশ্য ধরা পড়লেও ঘনাইয়ের খুব কিছু এসে যেত না। আশেপাশের চোদ্দটা পুলিশথানার সঙ্গে তার খুবই চেনা জানা। অনেক থানার বড়বাবুর বাড়িতেই সে বিজয়ার দিন সন্দেশের বাক্স নিয়ে প্রণাম করতে যায়। সে চোর হলে কী হবে, পুলিশ মহলে সবাই তাকে বিশ্বাস করে। সে যখনই

ধরা পড়ে কোনও থানায় গেছে, তখনই সে ঘরের ছেলের মতই খাতির পেয়েছে।

পুব আকাশে একটু একটু করে আলো ফুটছে। ঘনাই ভাবল, এখন যদি ভাল মত একটা স্নান করা যেত আর পেটটা পুরে খাবার পাওয়া যেত তাহলে ক্লান্তিটা একদম দূর হত! এই কথা ভাবতে ভাবতে ঘনাই এসে পৌঁছাল বোসপুকুরের ঘাটে।

ভোরের নরম আলোয় পুকুরটা যেন হাসছে। শিশির ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তুলেছে। একমিনিটও দেরি করল না ঘনাই। থলেটাকে ফেলে রেখে গুনে গুনে ঠিক বারো পা দূর থেকে ছুটে এসে ঝাঁপ দিল ঝপাং।

বাগান জুড়ে ডেকে উঠল পাখি। পাতিহাঁসদুটো ল্যাগব্যাগ করে ছুটল। এমন কাণ্ড তারা দেখেনি কখনও! বোসপুকুরে মানুষ নেমেছে! ঘনাইও হড়াশ ফড়াশ করে উল্টো সাঁতার, চিত সাঁতার আর ডুব সাঁতার কাটল টানা আধঘণ্টা। এমন আরামের স্নান বহুদিন করেনি সে। তারপর জল থেকে উঠে মাথা মুছে গাছ থেকে একটা বড় কাঁঠাল পেড়ে, সেটা ভেঙে পা ছড়িয়ে বসল ছায়ায়।

গুড়ের থেকেও মিষ্টি এক একটা কোয়া মুখে ফেলতে লাগল আর চোখ বুজে ভাবতে লাগল, সামনের সাতদিন কোথায় কোথায় যেতে হবে।

মিত্তিরদের সিন্দুকটা আছে শোবার ঘরে। পরশুই একবার ঢু মারতে হবে সেখানে। জগদীশের গুদাম থেকে এক বস্তা আলু সরাতে হবে কালই। হরিহর পাড়ায় সতেরো আর উনিশ নম্বর বাড়িতে নতুন বাসন কোসন কেনা হয়েছে বলে খবর এসেছে। দু'একদিনের মধ্যেই যেতে হবে।

ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এল ঘনাইয়ের। ঢুলুনি এল। এমন সময় হঠাৎ তার মাথার মধ্যে একটা কী যেন হল! যেন একসঙ্গে জ্বলে উঠল একশ তুবড়ি! ফেটে উঠল পাঁচশ কালীপটকা!

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ঘনাই। দরদর করে ঘামছে। চোখ দুটো বড় বড় আর লাল। মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে। এ তার কী হল!

ফিসফিস করে আপন মনে বলল, "ছি ছি, এ আমি কী করছি? চুরি করা তো পাপ। আমি কিনা সে কাজটাই করছি? কী লজ্জা! কী লজ্জা! আজ থেকেই ওসব ছাড়লাম।"

এই বলে চুরি করা মাল ভর্তি থলেটাকে কাঁধে ফেলে ঘনাই হনহন করে থানার দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁসদুটো আবার হেলতে দুলতে এসে বোসপুকুরে নেমে পড়ল।

বড়বাবুর দুঃখ

ভুবনপুর পুলিস থানার বড়বাবুর মনটা আজ সকাল থেকে বিগড়ে আছে। আসলে হয়েছে কী, গিন্নি আজ ধরে ফেলেছে যে তিনি থলে ভর্তি করে বাজার করে আনেন বটে কিন্তু একটা কানাকড়িও খরচ করেন না। অথচ রোজ গিন্নির কাছ থেকে গুনে গুনে সাঁইত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা হাত পেতে নেন বাজার খরচ বাবদ। মুশকিলটা হল আলুওলা, বেগুনওলা, মাছওলা, ফুলকপিওয়ালা, কাঁচালঙ্কাওলা প্রত্যেকেই তাদের থানার বড়বাবুকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কিছুতেই পয়সা নিতে চায় না। এখন গিন্নি কড়া হুকুম দিয়েছে, এক বছরের বাজার খরচ ফেরত দিতে হবে। সাঁইতিরিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা ইনটু, তিনশো পঁয়ষট্টি! কত টাকা! বাপরে! কে তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এই টাকা এখন দেবে? এরপরেও কারোর মন ভাল থাকে? এইরকম একটা সময় ঘনাই এসে ঘরে ঢুকল। পিঠের থলেটাকে টেবিলের ওপর রাখল।

বলল, "স্যার, আমাকে গ্রেপ্তার করুন।"

বড়বাবু মুখটাকে এমন করেছিলেন যেন এখুনি তিনি রসগোল্লার বদলে ভুল করে গোটা কতক উচ্ছে সেদ্ধ খেয়ে ফেলেছেন। সেই ব্যাজার মুখেই বললেন, "ঘনাই ইয়ার্কি মারিসনি। মন মেজাজ আজ একেবারেই ভাল নেই। ঐ থলেতে নতুন শাড়ি টাড়ি কিছু থাকলে বউদির জন্য রেখে কেটে পড়।"

ঘনাই এবার চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে বলল, "ছি ছি স্যার, ওকথা মুখে আনবেন না। আপনি পুলিশ। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনি কেন চুরির

মালের ভাগ নেবেন? নাঃ আপনাকেও দেখছি একবার পুকুরে ডুব দিয়ে আনতে হবে।"

"কী বলছিস যা-তা? সকালেই সিদ্ধি গিলেছিস নাকি! যত্তসব অ্যান্টিসোশাল এলিমেন্ট কোথাকার।"

"না স্যার, যা-তা বলছি না। আমি কি কখনও ভুল খবর দিয়েছি? ঐ বোসবাগানের পুকুরে একবার ডুব দিয়ে দেখুন না, আপনার ভেতরকার সব খারাপ জিনিসগুলো একেবারে ধুয়ে মুছে যাবে। আমি আজই একেবারে হাতেনাতে টের পেয়েছি।"

বড়বাবুর এবার যেন কেমন সন্দেহ হল। সত্যি তো, ঘনাই তো কখনও ভুল খবর দেয় না! অন্তত এতদিন ধরে দুজনে কাছাকাছি আছে কখনও তো ঠকায়নি। তবে? সত্যি বোসবাগানের পুকুর খারাপকে ভাল করে দিচ্ছে নাকি! "স্যার, অত ভাববেন না। নিজে পরীক্ষা করে দেখে আসুন কথাটা সত্যি কি মিথ্যে। তার আগে সেপাইকে ডেকে আমাকে হাজতে পুরুন। আমি আত্মসমর্পণ করতে এসেছি। আমি পাপের শাস্তি পেতে চাই," বলল ঘনাই।

বড়বাবু বললেন, "যা যা, মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিসনি। আমি এখনই বোসবাগানে তদন্তে যাব। গিয়ে যদি দেখি তোর কথা মিথ্যে, তাহলে তো বুঝতেই পারছিস—।"

তিনি সেপাই শিউচরণকে ডেকে বললেন, "ঘনাইকে হাজতে পুরে দে।"

নির্বাচিত কমিশনার

বড়বাবুর জিপ গাড়িটা যে বাড়িটার সামনে এসে নিরাপদে দাঁড়াল সেই বাড়ির মালিক হলেন প্রিয়নাথ রায়। ভুবনপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। খুবই নামডাক আছে। গতবারের ইলেকশনে তিনি পাঁচশ সতেরো ভোটে জেতেন। তারপরই তিনি আস্তে আস্তে এই বাড়িটা তৈরি করে ফেলেছেন। বাড়ির নাম 'কষ্ট করে'। সত্যি, বাইরে থেকে 'কষ্ট করে'কে একেবারে কুঁড়েঘরের মতই দেখতে। ভাঙা টালির ছাদ, ঘুনধরা জানলা-দরজা, মাটির দাওয়া, বাঁশের খুঁটি। কেউ দেখা করতে এলে প্রিয়নাথবাবু এই মাটির দাওয়া বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে

বসেন।

'কষ্ট করে'র ভেতরটা কিন্তু অন্যরকম। দামি সোফা, কার্পেট, পর্দা, এয়ারকন্ডিশন মেশিন। তবে ভেতরের কথা তো সবাই জানে না। বিশেষ বিশেষ দু-একজনেরই শুধু ভেতরে ঢোকার অনুমতি আছে। বড়বাবু গাড়ি থেকে নেবে, এদিক ওদিক দেখে টুপিটা দিয়ে মুখটা ঢেকে টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

প্রিয়নাথবাবু তখন বাড়ির দোতলার প্ল্যান বানাচ্ছিলেন আর মনে মনে ভাবছিলেন, "আর কতদিনই বা কমিশনার রয়েছি। পরের বারের ইলেকশনে ভোটাররা হারিয়ে দিলেই তো হয়েছে। তাই এখনই বাড়ির দোতলাটা বানিয়ে ফেলতে হবে। আর নিজের পকেটের পয়সা তো খরচ হচ্ছে না। ভুবনপুরের রাস্তা তৈরি, হাসপাতাল বানানো, দু'তলা বাড়ি মেরামতের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কতই না ইট, বালি, চুন, সুরকি, সিমেন্ট আছে। সেখান থেকেই কিছু কিছু সরিয়ে নিতে হবে।"

এই কথা ভেবে প্রিয়নাথবাবু একটা লম্বা কাগজে লিখতে শুরু করলেন ঃ ইট—রাস্তার। সুরকি—স্কুলবাড়ির। সিমেন্ট—হাসপাতালের। এমন সময় বড়বাবু ঘরে ঢুকে সোফায় বসে পড়ে হাঁপাতে শুরু করলেন। কাগজটা তাড়াতাড়ি গোল্লা পাকিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে পানের মত চিবোতে চিবোতে প্রিয়নাথবাবু বললেন, "পান খাবেন বড়বাবু? মিঠে পান। চুন, খয়ের, সুপুরি, দোক্তা, এলাচ, জর্দা চারশ বিশ। দেব একটা বানিয়ে?"

"রাখুন আপনার পান।" ধমকে উঠলেন বড়বাবু। "এদিকে আমাদের প্রাণ যাওয়ার জোগাড়, আর আপনি সাতসকালে উঠে পান চিবোচ্ছেন।"

"কেন স্যার, কী হল?"

"ঘনাই যে খবরটা বলল, তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার আপনার সকলেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।"

"এ আবার কী অলুক্ষুণে কথা বলছেন বড়বাবু? দাঁড়ান, সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি, তারপর সবটা শুনতে হবে।" দরজা বন্ধ করে এলেন প্রিয়নাথবাবু।

প্রিয়নাথবাবু বড়বাবুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। দুচোখ ফেটে

জল! বড়বাবু বললেন, "আরে মশাই, আপনার তো চোখে জল আসছে। আর আমি ইতিমধ্যেই একদফা কেঁদে নিয়েছি। প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। তবে আমার মনে হয়, এখনই আমাদের একবার গিয়ে বোসবাগানের পুকুরটা সরেজমিনে পরীক্ষা করা উচিত। ঘনাইয়ের কথা সত্যি কি না, নিজেদের দেখতে হবে। তবে এর জন্য দরকার ভালরকমের খারাপ লোক, যাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমরা বোসবাগানের পুকুরে ফেলে দেব। তারপর দেখব সত্যি সে ভাল হয়ে যায় কি না। এরকম কাউকে আপনি চেনেন নাকি?"

প্রিয়নাথ রায় দু'মিনিট ভাবলেন। তারপর লাফ দিয়ে উঠলেন, "ইউরেকা! পাওয়া গেছে। ব্যাটার ওপর আমার অনেক দিনের রাগ। এবার বদলা নেব। চলুন বড়বাবু।"

অটলেশ্বর বাবা

ভুবনপুর চৌমাথায় বিরাট দোকান। দোকানের মাথায় আরও বড় সাইনবোর্ড কীর্তনিয়া শ্রীশ্রীঅটলেশ্বর বাবার দোকান। পিওর জিনিস সুলভে পাওয়া যায়। শনি, রবি ফ্রি'তে কীর্তন শোনানো হয়।

ক্যাশব্যাক্সের ঠিক পাশটিতে অটলেশ্বর বাবা বসে আছেন। কপালে চন্দনের তিলক। খালি গা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে গেরুয়া ধুতি। চোখদুটো বোঁজা।

মানুষটা গুণী। যেমন ভাল কীর্তন গাইতে পারেন, তেমনি ভাল জিনিসে ভেজাল মেশাতে পারেন। ধরবার উপায় নেই। ভাল কীর্তন বা কৃষ্ণ কীর্তন গাইতে গাইতে তিনি এক কেজি ময়দাকে ভেজাল মিশিয়ে দু'কেজি করে দেন। এক শিশি ঘি তিন শিশি হয়ে যায় স্রেফ তাঁর হাতগুণে। ঐ শনি, রবিবার সেদিন ফ্রি'তে খদ্দেরদের কীর্তন শোনানো হয়, সেই দিনদুটোই হল ভেজাল মেশানোর দিন। এসব কথা পুলিশও জানে না। অটলেশ্বর বাবার আরও একটা শখ আছে, শখ না বলে স্বপ্ন বলাই ভাল। সেটা হল ইলেকশনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ রায়কে হারিয়ে ভুবনপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হওয়া। গতবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হেরে গেলেন। ইচ্ছে আছে সামনের বারে আবার

দাঁড়াবেন। নুড়ি-পাথর মেশানো এক ঠোঙা চিনি দাঁড়িপাল্লায় তুলতে তুলতে অটলেশ্বর গান গাইছিলেন।

এমন সময় দোকানের সামনে এসে পুলিশের জিপটা থামল। একদিক থেকে নামলেন বড়বাবু, অন্যদিক থেকে নামলেন প্রিয়নাথবাবু। হাতজোড় করে, একগাল হাসি নিয়ে ছুটে গেলেন অটলেশ্বর বাবা। গদ্গদ কণ্ঠে বললেন, "দীন কুটিরে আজ কার চরণ স্পর্শ পড়ল? এ দেখছি ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হয়েছেন! আসুন আসুন। মরম আমার আকুল হল!"

প্রিয়নাথবাবু বললেন, "তা ভাল কথা। কিন্তু আপনি তো এটা জানেন না যে, আমাদের বড়বাবু খুব কীর্তনের ভক্ত। উনি আপনার নাম শুনেছেন কিন্তু গান শোনেননি। তাই ওনার অনুরোধ আপনি ওঁকে একদিন মন ভরিয়ে কীর্তন শুনিয়ে দিন।"

অটলেশ্বর মহা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আজই আসুন না। এখনই না হয় দু'কলি শুনিয়ে দিতাম।" এবার মুখ খুললেন বড়বাবু। বললেন, "না না। এখন নয়। আমি একা নিরিবিলিতে বসে শুনতে চাই। এই ধরুন আজ সন্ধের পরে যদি হয়? আমার গাড়ি এসে আপনাকে নিয়ে যাবে। তারপর কোথাও বসে, চাঁদের আলোয় আপনার কীর্তন শুনব। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।"

একটু ভাবলেন অটলেশ্বর। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এইভাবে যদি থানার বড়বাবুটাকে হাতে আনা যায়, তাহলে সামনের বারের ইলেকশনে জিততে সুবিধেই হবে। প্রিয়নাথটা দেখেছি ওকে খুব কব্জা করেছে। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি।

রাজি হয়ে গেলেন অটলেশ্বর বাবা।

তারপর যা ঘটল

পুকুরের দক্ষিণ দিকের ঘাটে সাদা ফরাস পাতা হয়েছে। সাজানো রয়েছে তিনটে তাকিয়া। খঞ্জনি, হারমোনিয়াম, তানপুরা সব রয়েছে। যে কীর্তনের সঙ্গে যেটা লাগবে। ফরাসের এককোণে ধূপধানিতে ধূপ জ্বলছে। বিকেল বিকেল থানা থেকে এসে সেপাই শিউচরণ সব

সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে গেছে।

চাঁদের আলোয় আর ধূপের গন্ধে বোসবাগান জুড়ে বেশ একটা ভক্তি ভক্তি ব্যাপার এসে গেছে। অন্ধকার আর একটু গাঢ় হতেই বনবাদাড় ঠেলে খটর মটর শব্দ তুলে বড়বাবু প্রিয়নাথ রায় আর অটলেশ্বর বাবা এসে পৌঁছলেন। তিনজনে এসে ফরাসের ওপর বসলেন। অটলেশ্বর বাবা বললেন, "সত্যিই সুন্দর! কীর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ! শান্ত নির্জন। সম্মুখে সরোবর। তথায় শালুক প্রস্ফুটিত! চন্দ্রকিরণ যেন তাঁরই মহিমা!"

প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে বড়বাবুর চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। প্রিয়নাথবাবু বললেন, "ঠিকই বলেছেন বাবাজী, তবে আজ বড় গরম। এখন যদি একটু স্নান করতে পারতাম, তাহলে বোধহয় কীর্তনের আসরটা আরও মধুর হত। কী বলেন বড়বাবু?"

বড়বাবুর মুখে যেন উত্তরটা ঝুলছিল। বললেন, "ঠিক কথা। তা সে আর অসুবিধের কী আছে? আসুন না, সবাই মিলে পুকুরে একটা করে ডুব দিয়ে নিই? জলটা তো দেখে মনে হচ্ছে চমৎকার। কী বাবাজী, আপনি কী বলেন?"

এতক্ষণ খঞ্জনিতে টুংটুং আওয়াজ তুলছিলেন আর চোখ বুজে ঘাড় নাড়াচ্ছিলেন অটলেশ্বর। বড়বাবুর পুকুরে ডুব দেওয়ার প্রস্তাব শুনে খঞ্জনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবার তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। কোথায় গেল সেই একগাল হাসি আর গদগদ ভাব? রাগে যেন চোখ দুটো জ্বলছে! কোমরে হাত দিয়ে বললেন, "বলি ব্যাপারটা কী? আমি কী কিছু জানি না? আপনার শিউচরণ কীর্তন শুনতে এসে আমাকে সব বলে দিয়েছে। ঘনাই চোরের আজ কতটা দুর্দশা হয়েছে আমার জানা নেই ভেবেছেন? আমি ভাল হয়ে গেলে আমার ব্যবসা যে লাটে উঠবে সেকথা আপনারা জানেন? বুঝেছি, কীর্তন শুনব বলে নিয়ে এসে আমাকে 'ভাল' বানানোর ফাঁদ পাতা হয়েছে?"

বড়বাবু খপ্ করে বেল্ট থেকে রিভলবারটা খুলে বাবাজীর দিকে তাক করে বললেন, "অতশত জানি না, আপনাকে পুকুরে ডুব দিতেই হবে। আমি পুলিশ। আমার হুকুম আপনাকে মানতে হবে। আমি দেখতে চাই ঘনাইয়ের কথা সত্যি না মিথ্যে।"

এদিকে রিভলবার দেখে প্রিয়নাথবাবু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। তিনি তানপুরাটা বন্দুকের নলের মত অটলেশ্বর বাবার দিকে বাগিয়ে ধরে একটা গাছের আড়ালে সরে যেতে লাগলেন, "ঠিক কথা। পুকুরে নামতে হবে। খারাপ থাকা বের করে দেব। আমার বিরুদ্ধে যখন ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন তখন মনে ছিল না? অ্যান্টিসোশ্যাল এলিমেন্ট কোথাকার।"

অটলেশ্বর বাবারও এখন করার কিছু নেই। সামনে রিভলবারের নল, পেছনে তানপুরা। পালাবার পথ নেই। তাঁর ধুতির কোঁচা খুলে গেছে। রাগে মাথার চুলগুলোও খাড়া হয়ে গেছে। "ইস! ব্যাটা প্রিয়নাথের কাছে কিনা শেষপর্যন্ত এতটাই ঠকতে হল?" ভাবতে ভাবতে দু'হাত তুলে গুটি গুটি পায়ে পুকুরের দিকে এগোতে লাগলেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বললেন, "বড়বাবু, ভাল যখন হতেই হচ্ছে, তখন শেষ একটা ইচ্ছেপূরণ করতে দেবেন?"

বড়বাবু রিভলবার নাচাতে নাচাতে বললেন, "এটা পুলিশের এথিক্স। ফাঁসি দেওয়ার আগে আমরা অপরাধীর শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে দিই। আপনার কী ইচ্ছে চটপট বলে ফেলুন।"

"আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে কীর্তন গাইতে গাইতে পুকুরে ডুব দিতে চাই।"

"ঠিক আছে, রাজি।"

অটলেশ্বর গদগদ মুখে হারমোনিয়ামটা গলায় ঝুলিয়ে গান গাইতে গাইতে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। ঠিক শেষ সিঁড়িতে পৌঁছেই সটান ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। দু'হাত দিয়ে হারমোনিয়ামটা ছুঁড়ে মারলেন বড়বাবুর দিকে। বড়বাবু কিছু বুঝতে না পেরে রিভলবারের নলটা আকাশের দিকে করে ট্রিগারটা দিলেন টিপে। গুড়ুম! তারপরই হারমোনিয়ামের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে দিলেন এক লাফ। গিয়ে পড়লেন অটলেশ্বরের কাঁধে! দু'জনেই ঝপাং করে পড়লেন একদম পুকুরে।

মজা দেখবেন বলে আগে থেকেই প্রিয়নাথবাবু গাছের ডালে উঠে বসেছিলেন। গুলির শব্দে তিনিও চমকে দিয়ে ডাল ভেঙে

পাতাটাতা নিয়ে একদম পুকুরের জলে এসে পড়লেন। হ্যাঁচোর প্যাঁচোর করতে করতে তিনজন যখন পুকুর থেকে উঠে এলেন, তখন সে এক দেখবার মত দৃশ্য। বড়বাবুর মাথার টুপি অটলেশ্বর বাবার মাথায়, অটলেশ্বর বাবার রুদ্রাক্ষের মালা প্রিয়নাথ রায়ের কপালে। তিনজনেরই গা থেকে জল ঝরছে।

একদম শেষে

ভুবনপুর পুলিশ থানার বড়বাবুর দাপটের কথা তখন আশেপাশের এলাকার মানুষও জানেন। বড়বাবুর ভয়ে ভুবনপুরে চুরি ডাকাতি একদম বন্ধ। এখন কেউ আর ভয় দেখিয়ে বাজারে মাছওলার কাছ থেকে মাছটা, আলুওলার কাছ থেকে আলুটা জোর জবরদস্তি নিতে পারে না। তেমনি কাজ করছেন বটে ভুবনপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত কমিশনার প্রিয়নাথ রায়। রাস্তা তৈরির কাজ শেষ, হাসপাতাল বানানোর কাজ চলছে, স্কুল বাড়িটারও মেরামত হয়ে গেছে। আর প্রিয়নাথবাবু নিজের বাড়িটা মিউনিসিপ্যালিটির নামে লিখে দিয়েছেন। সেখানে একটা লাইব্রেরি হচ্ছে। ওহো! 'কীর্তনিয়া শ্রীশ্রীঅটলেশ্বর বাবার দোকান'-এর কথা তো বলাই হল না। ভুবনপুরে খাঁটি জিনিস কম দামে পেতে হলে, ঐ দোকানেই এখন যেতে হবে। গরিব মানুষকে উনি ধারেও জিনিস দেন। আর হ্যাঁ, গত কয়েকদিন হল শনি রবিবার বিকেলে উনি ফ্রি'তে কীর্তন শেখাচ্ছেন। প্রথম মাসে কালী কীর্তন, পরের মাসে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

আর বোসবাগানের আশ্চর্য পুকুর? সেই একইরকম আছে। টলটলে চমৎকার জল। শান্ত। নির্জন। বোসবাগানে যেতে কোনও ঝামেলা নেই। এই তো সকালবেলার ট্রেনে উঠে—।